বাংলার জমিদারঃ রাজা নরেন্দ্রলাল খান ও তাঁর কার্যাবলী

(১৮৬৭-১৯২০ সাল)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. (ইতিহাস)

উপাধির জন্য প্রদত্ত – গবেষণা সন্দর্ভ

মৌসুমী পাল

শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৬-২০১৯

ক্রমিক সংখ্যা(শ্রেণী) – ১০১৬০০৬০৩০১২

ক্রমিক সংখ্যা(পরীক্ষা সংক্রান্ত) – MPHFHI1902

রেজিস্ট্রেশন নং – ১৩৮৫২৯ (২০১৬ – ২০১৭)

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৭০০০৩২

CERTIFICATE

Date : 14.05.2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that the dissertation titled "বাংলার জমিদারঃ রাজা নরেন্দ্রলাল খান ও তাঁর কার্যাবলী (১৮৬৭-১৯২০ সাল)" being submitted by Ms. Mousumi Pal has been written under my guidance and supervision during 2017-2019.

This dissertation is approved for the submission towards the partial fulfillment of the requirement for the degree of Master of Philosophy, in the faculty of Arts, Jadavpur University.

14/5/19

Supervisor

Subhasis Biswas

Professor

Department of History

Jadavpur University

Kolkata- 700032

Professor
Department of History
Jadavpur University
kolkata-700 032

14.5.19

Head of the Department

Department of History

Jadavpur University

Kolkata- 700032

Head
Department of History
Jadavpur University
Kolkata- 700 032

DECLARATION

I, Ms., Mousumi Pal, Roll Number- MPHFHI1902 do hereby declare that the dissertation titled "বাংলার জমিদারঃ রাজা নরেন্দ্রলাল খান ও তাঁর কার্যাবলী (১৮৬৭ – ১৯২০ সাল)" submitted by me in order to fulfill the partial requirement for the degree of Master of Philosophy (M.Phil) in History at Jadavpur University, session 2016-2019.

This work is original and no part of it is submitted anywhere else for any other degree or diploma.

Mousumi Pal
(Signature of the Student)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল গবেষণা প্রসঙ্গে আমার বর্তমান তত্ত্বালোচনাটির অবতারণা। উক্ত গবেষণামূলক প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে একাধিক মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের অবর্ণনীয় ভূমিকা রয়েছে, যাঁদের সাহায্য না পেলে আমার এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি কখনোই সম্পূর্ণ হত না।

প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগকে, যারা আমাকে এই গবেষণা কার্যটি করার সুযোগ করে দিয়েছেন। প্রথমেই আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ডঃ শুভাশিষ বিশ্বাস মহাশয়কে। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণ করার ক্ষেত্রে তাঁর অমূল্য নির্দেশনা, তত্ত্বাবধান, উৎসাহ ও সহযোগিতা আমাকে সবসময় সঠিক দিক নির্দেশ করেছে। তাঁকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। একইসাথে আমি ধন্যবাদ জানাই ডঃ মহুয়া সরকার মহাশয়াকে। তাঁর উপদেশ, সান্নিধ্য, সহায়তা ও সুপরামর্শ আমাকে গবেষণা পত্রটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রধান প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। উভয়েই শত ব্যস্ততার মধ্যেও যেভাবে সর্বদা আমার গবেষণা পত্রটিকে সম্পূর্ণ করতে প্রেরণা দিয়েছেন, তাতে আমি নিঃসন্দেহে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। এই উপলক্ষে তাঁদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রনাম নিবেদন করি।

এরপর আমি কৃতজ্ঞতা ও প্রনাম জানাই আমার ইতিহাস বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাবৃন্দকে, যাঁদের কাছে আমি বিভিন্ন সময় নানান সহায়তা ও পরামর্শ পেয়েছি। পাশাপাশি বিভাগীয় গ্রন্থাগারের প্রধান আধিকারিক বনানী রায় এবং জয়শ্রী চৌধুরী দিদিকেও ধন্যবাদ। যাঁরা বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ দিয়ে এই গবেষণাটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন।

একইসঙ্গে আমি ধন্যবাদ জানাই আমার নিজের পেশাগত ক্ষেত্র- আমার কলেজ ‘গড়বেতা কলেজ’কে। আমার কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ ডঃ হরিপ্রসাদ সরকার মহাশয় আমাকে এই এম.

ফিল গবেষণা সম্পূর্ণ করার জন্য বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। এরপর আমি ধন্যবাদ জানাই আমার কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ – অধ্যাপক মানস কুমার রানা, অধ্যাপক সুশান্ত কুমার মন্ডল ও ডঃ সাজেদ বিশ্বাসকে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের সার্বিক সাহায্য ছাড়া এই গবেষণাপত্রটি যে সম্পন্ন হত না, তা বলাই বাহুল্য। বিভাগীয় বিভিন্ন দায়দায়িত্ব থেকে তাঁরা আমাকে অব্যাহতি দিয়ে গবেষণাপত্রটি লেখা ও স্বাধীনভাবে ভাবনা-চিন্তা করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এছাড়া আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই আমার অগ্রজপ্রতিম ও বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মঙ্গল কুমার নায়ককে। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও পি.এইচ.ডি গবেষণাপত্রটি আমার গবেষণা সম্পূর্ণ করতে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাঁর মূল্যবান উপদেশ ও কয়েকটি দুর্লভ গ্রন্থের সরবরাহ আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করেছিল।

পাশাপাশি অন্যান্য একাধিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ ও দায়বদ্ধ। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে আমি অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ করেছি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, জাতীয় গ্রন্থাগার, দ্য রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচার, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, গড়বেতা কলেজের বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার, রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ – এই সব প্রতিষ্ঠানের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানার আধিকারিক রীনাদি সহ এই প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মীবৃন্দকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমার গবেষণার কাজে বিপুল সহায়তা করেছেন। এরপর যাঁরা বর্তমান গবেষণাকর্মের সূচনা থেকে আমাকে ক্রমাগত উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে উক্ত গবেষণা পত্রটি সম্পূর্ণ করার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ জয়শ্রী লাহা, ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ রীনা পাল ও ডঃ মিতা বিশ্বাস মহাশয়াকে। ধন্যবাদ জানাতে চাই এই কলেজের সমস্ত অশিক্ষক কর্মচারীবৃন্দকে –

সাগরিকাদি,সুমিতাদি,মালাদি ও জগন্নাথদাকে, যাঁরা এই মহাবিদ্যালয়ে ছবি তুলতে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

এই গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে আমাকে সহায়তা করার জন্য আমি আরও কয়েকজনকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইব। আমি ধন্যবাদ জানাই গড়বেতা কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ রীতা শীল ও অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ মুদি, ভূগোলের অধ্যাপক উত্তম সরকার, অর্থনীতির অধ্যাপক পৃথ্বীশ হাইত ও ডঃ সজল কুমার জানা, বানিজ্য বিভাগের অধ্যাপক ডঃ শান্তিময় পাত্র ও অধ্যাপক সুশীল বেরা মহাশয়কে এবং অন্যান্য অধ্যাপকদের। এছাড়াও ধন্যবাদ জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের কয়েকজন গবেষক ও গবেষিকাকে, যথা- শুভঙ্কর দে, প্রসেনজিৎ দাস, অমিয় বাগাল, শ্রাবনী মন্ডল, সায়নী রায়, শ্রাবন্তী কর্মকার সহ আরও অনেককে, যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমার পাশে থেকেছেন গবেষণা প্রকল্পটি তৈরীর ক্ষেত্রে।

এরপর আমি ধন্যবাদ জানাই নাড়াজোল রাজপরিবারের সমস্ত সদস্যদের, বিশেষভাবে ‘নাড়াজোল পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণ কমিটি’র কর্ণধার সন্দীপ খানের প্রতি। এছাড়া ধন্যবাদ জানাই লেখক শ্রী দেবাশিষ ভট্টাচার্য মহাশয়কে। আমার গবেষণা পত্রটির প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক তথ্য দিয়ে তিনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

আমি আন্তরিক প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানাই আমার পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে যাঁদের আশীর্বাদ, সহযোগিতা, বিশ্বাস ও অনুপ্রেরণা না থাকলে আমার পক্ষে এই গবেষণা করা সম্ভব হত না। প্রথমেই আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই আমার মা ও বাবাকে, যাঁদের সাহায্য ও অনুপ্রেরণা কোন কৃতজ্ঞতা দাবি করে না এবং যাঁরা আমাকে সর্বদা মানসিক দৃঢ়তা প্রদান করে এসেছেন। আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। আমি কৃতজ্ঞ আমার কাকু, কাকিমা ও বোনের প্রতি। সমগ্র গবেষণা পর্বে তাঁরা যেভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন, তা বলাই বাহুল্য। এজন্য তাঁদের প্রতি আমি যথাযোগ্য স্থানে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই। এছাড়া

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ সেই সব মানুষের প্রতি যাঁরা কোনরকম স্বীকৃতি ছাড়াই আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। সেই সমস্ত মানুষকে যথাযোগ্য স্থানে আমার ঐকান্তিক সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই।

মৌসুমী পাল

এম. ফিল গবেষিকা

ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয়সূচী

১. পরিশিষ্টের তালিকা ১-৩

২. ভূমিকা ৪-১৮

৩. প্রথম অধ্যায়ঃ জমিদারবংশের ইতিবৃত্ত ১৯-৩৩

৫. দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ রাজা নরেন্দ্রলাল খানের রাজনৈতিক জীবন ৩৪-৪৮

৬. তৃতীয় অধ্যায়ঃ রাজা নরেন্দ্রলাল খানের সমাজসেবা ও
সাংস্কৃতিক কার্যাবলী ৪৯-৬৪

৭. উপসংহার ৬৫-৬৮

৮. পরিশিষ্টঃ গবেষণায় ব্যবহৃত নথিপত্র ৬৯-১০৩

৯. চিত্রসূচী ১০৪-১০৭

৯. গ্রন্থবিবরণী ১০৮-১১১

পরিশিষ্টের তালিকা

রাজ্য মহাফেজখানা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ৬৯-৮২

১. Zamindars and influential supporters in the Midnapore Conspiracy

২. List of persons under arrest (Midnapur Case)

৩. Secret Society at Midnapur disclosed by the confession of Santosh Chandra Das

৪. Translation copies of entries in Rakore (Account books) of the Raja of Narajole, 1315 (Amuly) (1907 & 1908) which he deposited in the Civil Court in Muttarka suit No.5 of 08.

৫. Extract from a report dated 3-8-08, submitted by Inspector Lalmohan Guha of Midnapur

৬. Bail application of Raja Narendralal Khan, 1st September, 1908

৭. Specific instances

৮. Paid some rupees for the preparation of the Bombs

৯. In September, 1908 the following persons were arrested and placed on their trial under Sections 4, 5 and 6 of Act VI of 1918 (Explosive Act)

Amrita Bazar Patrika থেকে প্রাপ্ত তথ্য ৮৩-৮৯

১. The Narajole Raja's arrest and incarceration, September 5, 1908

২. Rumour about the Raja’s bail, September 6, 1908

৩. How the incarceration of the raja has affected the poor, September 7, 1908

৪. Bail refused : Raja’s mind seriously affected, September 14, 1908

গৌণ উপাদান থেকে প্রাপ্ত তথ্য **৯০-৯৯**

১. ১৮৩৪ এবং ১৮৩৬ শকাব্দে ঘাটাল- নিমতলা সংস্কৃত সমিতির বাৎসরিক হিসেব বা বিবরণ (সূত্রঃ দেবাশিষ ভট্টাচার্য, ‘নাড়াজোলঃ এক অনন্য জনপদ’)

২. ঘাটাল-নিমতলা সংস্কৃত সমিতির মহা পরিচালক পন্ডিত মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রদত্ত রাজা নরেন্দ্রলাল খানকে দেওয়া অভিজ্ঞানপত্র (সূত্রঃ দেবাশিষ ভট্টাচার্য, ‘নাড়াজোলঃ এক অনন্য জনপদ’)

৩. হৃতগৌরব ফিরে পেতে বাংলার গভর্ণরকে দেওয়া রাজা নরেন্দ্রলাল খানের চিঠি (সূত্রঃ Dr. Pranab Kumar Chatterjee, ‘Midnapur’s Tryst with Struggle’)

ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য **১০০-১০১**

১. মেদিনীপুরে জলের সুব্যবস্থা করতে ইংরেজ সরকারকে চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের প্রত্যুত্তর (সূত্রঃ ডঃ মঙ্গল কুমার নায়ক)

মানচিত্রের তালিকা **১০২-১০৩**

১. ১৮৭৪ সালের মেদিনীপুর (‘ঘাটালের কথাঃ ঘাটাল মহকুমার ইতিহাস ও সমাজচিত্র’, পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ ও প্রণব রায়, দুই খন্ড একত্রে)

২. মেদিনীপুর ও ঘাটাল অঞ্চলের মানচিত্র (‘ঘাটালের কথাঃ ঘাটাল মহকুমার ইতিহাস ও সমাজচিত্র’, পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ ও প্রণব রায়, দুই খণ্ড একত্রে)

সূচনা

'জমিদার' শব্দটি এসেছে ফার্সী যৌগিক শব্দ 'জমিনদার' থেকে, যার অর্থ 'জমির মালিক'। বাংলা, এমনকি সমগ্র ভারতের শাসকগোষ্ঠী তথা রাজা বা জমিদারদের উদ্ধত, অত্যাচারী, অর্থলোভী ও প্রজাপীড়নকারী হিসাবে চিত্রিত করা হয়ে থাকে। মুঘল যুগের লেখাপত্রে ব্যবহৃত 'জমিনদার' শব্দটির অর্থ সম্পর্কে তৎকালীন কোন উপাদানে সেভাবে উল্লেখ নেই। মনে করা হয়, মুঘল আমলে 'জমিনদার' বলতে আসলে বোঝাত সামন্ত প্রধান[১]। ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের পরে খাজনা আদায়কারী হিসাবে জমিদারেরা পরিচিত হতে থাকেন। জমিদার আইনের দৃষ্টিতে জমির মালিক হিসেবে গৃহীত হলেন এবং মালিকানাসত্ত্বের নানা অধিকারে ভূষিত হলেন। মালিক হওয়ার দরুন যে অধিকার ও দাবী আইনত রায়তকে দেওয়া হয়নি, তা জমিদারবর্গের এলাকাভুক্ত বলে গণ্য হল।[২] ফলস্বরূপ, দেশীয় রাজা বা জমিদারের বিলাস ব্যসন, জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রজাপীড়ন সাধারণ বিষয় হিসাবে দেখা দেয়।

ব্রিটিশ যুগে জমিদারদের অত্যাচারের বিবরণ বিভিন্ন গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধে বিবৃত হয়েছে-

[১] হবিব, ইরফান "মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা (১৫৫৬-১৭০৭), প্রকাশক কে পি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫, পৃঃ ১২৮।

[২] সেন, শচীন, "বাংলার রায়ত ও জমিদার", বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, প্রকাশক, শ্রী পুলিনবিহারী সেন, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১ লা জ্যেষ্ঠ, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১১

"জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙালী কৃষকের শত্রু বাঙালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে; জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃতপক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়শোণিত পান করা দয়ার কাজ। কৃষকদিগের অন্যান্য বিষয়ে যেমন দুর্দ্দশা হউক না কেন, এই সর্ব্বরত্ন-প্রসবিনী বসুমতী কর্ষণ করিয়া তাহাদিগের জীবনোপায় যে না হইতে পারিত, এমত নহে। কিন্তু তাহা হয় না; কৃষকে পেটে খাইলে জমীদার টাকার উপর টাকার রাশি ঢালিতে পারেন না। সুতরাং তিনি কৃষককে পেটে খাইতে দেন না।"[৩]

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার বিরুদ্ধে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জয়লাভ, ১৭৬০ সালে নবাব মীরকাশিমের কাছ থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইজারা নিয়ে মেদিনীপুর জেলার শাসনভার গ্রহণ এবং পরবর্তীকালে ১৭৬৫ সালে মোঘল সম্রাটের কাছ থেকে তারা লাভ করে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী।[৪] ব্রিটিশ কোম্পানীর লক্ষ্যই ছিল যত বেশি সম্ভব ভূমি রাজস্ব আদায় করা। ১৭৯৩ সালে খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের সঙ্গেই করা হয়। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিশাল ভূখণ্ডের প্রতিটি অংশেই কর ধার্য হত এবং জমিদারেরা সেই কর দিতে না পারলে

[৩] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিবিধ প্রবন্ধ-"বঙ্গদেশের কৃষক", বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র বাঙলা রচনা, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক লিখিত, বঙ্কিম সাহিত্যের পরিচয় সমন্বিত, প্রকাশক সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।

[৪] হরিসাধন দাস, "মেদিনীপুর সম্পদ", প্রথম প্রকাশ ৩০ শে আষাঢ়, ১৩৯৫, মেদিনীপুর, পৃঃ ১

ইংরেজ সরকার সেই জমিদারীকে বাজেয়াপ্ত করত এবং নিলামে বিক্রি করে দিত।[৫] বস্তুত এর ফলেই যে সমস্ত জনপদ জনবহুল ছিল এবং যে সব জেলার কর্ষণযোগ্য জমির বেশিরভাগ কর্ষণাধীন ছিল,সেখানে ভূমিরাজস্বের চাপ জমিদারবর্গকে নিদারুণভাবে আঘাত করল।[৬] এবং জমিদারী হস্তান্তরের পথ সুগম হল। এর ফলে অনেক সময়ই প্রাচীন জমিদার বংশের পরিবর্তে নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই শ্রেণী সম্পূর্ণ নিজেদের স্বার্থে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে যতখানি আগ্রহী ছিল প্রজাদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যাপারে ছিল উদাসীন। দেশের 'সেবক'এর পরিবর্তে জমিদারেরা দেশ 'শোষক'এর ভূমিকা গ্রহণ করলেন। আবার প্রায় একই সময়ে খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে কৃষক ও জমিদারদের মধ্যে মধ্যসত্বভোগীদের আবির্ভাব হওয়ায় ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা জটিল আকার ধারণ করে এবং কৃষকদের উপর অত্যাচারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।[৭]

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে ১৮৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত Zamindary Association[৮] এর নাম করা যায়। এই সংগঠনের মূল নীতি ছিল, 'ভূমি সম্পর্কীয়' যে কোন ব্যক্তি এই সংগঠনের সদস্য হতে পারবেন। যদিও বাস্তবে জমিদারেরাই ছিলেন এই সংগঠনের সভ্য।[৯] বলাই বাহুল্য, প্রজাস্বার্থ তথা কৃষকদের স্বার্থচিন্তা এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল না। আবার ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কলকাতার দেশীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রগুলি প্রতিবাদে সোচ্চার হলেও হিন্দু পেট্রিয়ট ও অমৃতবাজার পত্রিকা

[৫] শেখর বন্দোপাধ্যায়, "পলাশী থেকে পার্টিশনঃ আধুনিক ভারতের ইতিহাস", প্রকাশক ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রাঃ লিঃ, ২০০৬, পৃঃ ১০২

[৬] সেন,শচীন, ত্বদেব, পৃঃ ১০

[৭] Gouripada Chatterjee, "Midnapore: The Forerunner of India's Freedom Struggle", Delhi, 1986, pp. 110-112

[৮] যা পরে পরিচিত হয় Landholders Society নামে, যার প্রথম যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ও Englishman পত্রিকার সম্পাদক William Cold Hurry

[৯] রমেশ্চন্দ্র মজুমদার, "বাংলাদেশের ইতিহাস", তৃতীয় খণ্ড, প্রকাশক জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৫১২

স্পষ্টতই দেশীয় জমিদারদের পক্ষ নিয়ে লিখতে শুরু করে এবং জমিদারদের মুখপত্রে পরিণত হয়।[১০]

তবে প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও বলা যায়, উনিশ ও বিংশ শতক নাগাদ এমন কয়েকজন প্রজাকল্যাণকামী জমিদারের আবির্ভাব ঘটে, যারা শুধুমাত্র প্রজাসাধারণের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি বিধানে সচেষ্ট ছিলেন তাই নয়, একই সঙ্গে তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের জমিদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে প্রজাহিতৈষী জমিদারের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। পল্লী উন্নয়ন ও নানাবিধ সামাজিক কাজে সুব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ জনকল্যাণের এক অভিনব দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।[১১] এছাড়া হুগলি জেলার উত্তরপাড়ার জমিদার শ্রী জয়কৃষ্ণ মুখার্জী দানশীলতার জন্য আজও এই অঞ্চলে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

গবেষনার গুরুত্ব

১৭৬০ সালের ২৭ শে সেপ্টেম্বর বাংলার নবাব মিরকাশিম আলি এবং ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী চট্টগ্রাম (Chittagong), বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলা কোম্পানীর অধীনস্ত হয়।[১২] এই সন্ধিতে লিখিত ছিল যে, 'মেদিনীপুর জেলাতে অবস্থিত জমিদার ও তালুকদাররা যে যেখানে ছিলেন সেইরকম থাকবেন'। অর্থাৎ কোম্পানী বাহাদুর

[১০] শেখর বন্দোপাধ্যায়, ত্বদেব, পৃঃ ২৩৭

[১১] অমিতাভ চৌধুরী, "জমিদার রবীন্দ্রনাথ", বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ হইতে প্রকাশিত, শান্তিনিকেতন, প্রকাশকাল ১৯৭৬, পৃঃ

[১২] L.S.S.O'Malley, Bengal District Gazetteers: Midnapore,Calcutta, 1911, pp. 33

জমিদারি খাজনা লাভ করলেও মধ্যসত্ত্বভোগী জমিদারদের কোন মতেই উৎখাত করতে পারবে না বর্ধিত খাজনার লোভে।[১২]

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেন, তখন মেদিনীপুর জেলাতে জমিদারীর সংখ্যা ছিল ২৯ টি।[১৩] এগুলি হল – (১) নারায়ণগড়, (২) রামগড়, (৩) বগড়ী, (৪) লালগড়, (৫) নয়াগ্রাম, (৬) ঝাড়গ্রাম, (৭) শিলদা বা ঝাঁটিবনী, (৮) বেলেবেড়িয়া, (৯) জামবনী, (১০) মেদিনীপুর, (১১) ময়না, (১২) কাশীজোড়া, (১৩) ধারেন্দা, (১৪) মাজনামুঠা, (১৫) জলামুঠা, (১৬) সূজামুঠা, (১৭) বীরকূল, (১৮) চন্দ্রকোনা, (১৯) দাঁতন, (২০) বলরামপুর, (২১) তুরকা, (২২) বালিশাহী, (২৩) তমলুক, (২৪) মহিষাদল, (২৫) নাড়াজোল, (২৬) ব্রাহ্মণভূম, (২৭) চিতুয়া, (২৮) দিগপারুই ও কুতুবপুর এবং (২৯) জাড়া জমিদার।[১৪] আবার ১৮৭২ সালের আগে জেলায় রাজা বা জমিদারদের ৬৫ টি কেন্দ্রের কথা জানতে পারা যায়।[১৫] যদিও এইসব কেন্দ্রগুলির সঙ্গে আগের তালিকার পার্থক্য স্পষ্টই ছিল।

মেদিনীপুর জেলায় বহু জমিদার বংশ মুঘল সাম্রাজ্যাধিকারের অনেক আগে থেকেই এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও শাসন-শৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রকরূপে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – নারায়ণগড়ের পাল রাজবংশ, কর্ণগড়ের জমিদার

[১২] দাস, বিনোদশঙ্কর ও প্রণব রায়, "মেদিনীপুরঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন" (প্রথম খণ্ড), সাহিত্যলোক প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ১৫ ই আগষ্ট ১৯৮৯, পৃঃ ২১২, এছাড়া Rous Boughton, Dissertation Concerning the Landed Properties of Bengal, London, MDC XC 1, P-100

[১৩] L.S.S.O'Malley, Ibid ,P-

[১৪] যোগেশচন্দ্র বসু, "মেদিনীপুরের ইতিহাস", প্রথম প্রকাশ ১৩২৮ বঙ্গাব্দ, প্রকাশক সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশক অন্নপূর্ণা প্রকাশক, পৌষ ১৪১৬, কলিকাতা, পৃঃ ৩৮৩

[১৫] হরিসাধন দাস, ত্বদেব, পৃঃ ২১৯

বংশ, নাড়াজোলের খান বংশ, ধলভূমগড়ের রাজবংশ, তমলুক রাজবংশ, মহিষাদল রাজবংশ, কাশীজোড়ার বৃহৎ জমিদারী প্রভৃতি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রাজা-জমিদারেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের বংশের উৎপত্তি ও জমিদারী পত্তনের বিষয়ে নানারকম কিংবদন্তী প্রচার করেছিলেন। যাই হোক না কেন, মেদিনীপুরের প্রাচীন জমিদার বংশগুলির কেউ কেউ দুশো, কেউ বা চারশো, কেউ বা ছয়শো বা তারচেয়েও বেশি বছর নিজ নিজ অঞ্চলে প্রায় স্বাধীন, অর্ধ-স্বাধীন রাজা বা জমিদাররূপে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে এসেছেন।

শাসকবর্গের প্রতিনিধি হিসাবে শোষক ও অত্যাচারিত শ্রেণীর প্রতিভূ রূপে জমিদার শ্রেণীকে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু ইতিহাসে এমন কয়েকটি জমিদার বংশের নাম পাওয়া যায়, যারা শুধুমাত্র প্রাচীনত্বের দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য নয়, জনহিতৈষণা ও জনকল্যাণমূলক কার্যে নিজেদের সর্বদা নিয়োজিত রেখেছেন। নিজেদের এলাকার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের মূল্যবান পদচারণা লক্ষ্য করা যায়। যে কয়েকটি জমিদার বংশ এই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন, তাদের মধ্যে তৎকালীন বাংলার অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার নাড়াজোল রাজপরিবারের নাম উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে সম্মান ও খেতাব পাওয়া সত্ত্বেও বিদেশী শক্তি হিসাবে তাদের উচ্ছেদ করতে এই রাজবংশ প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছিল। তবে প্রথম দিকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই জমিদার বংশ পরোক্ষভাবে অর্থ সাহায্য করলেও পরবর্তীকালে প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য এই বংশের কয়েকজন জমিদারকে কারাবরণ করতে হয়। তবে শুধুমাত্র স্বাধীনতা আন্দোলনে নয়, নাড়াজোলের মতো একটি

প্রত্যন্ত গ্রামে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা ও স্থাপত্য-শিল্পের বিকাশে এই বংশের জমিদারেরা যথার্থই তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

নাড়াজোল জমিদার বংশের যোগ্য উত্তরসূরি রাজা নরেন্দ্রলাল খানের জীবন ও কার্যাবলী ব্যাপক অনুসন্ধানের বিষয়। একদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থক এই জমিদার বংশের প্রথম ব্যক্তি হিসাবে কারাবরণ এবং অন্যদিকে সাহিত্যচর্চা ও জেলার সাস্কৃতিক ক্ষেত্রের বিকাশ ও উৎসাহদানে তাঁর ভূমিকা ছিল অসামান্য। ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ছাড়াও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নাড়াজোল জমিদার বংশ বিশেষকরে রাজা নরেন্দ্রলাল খানের অবদান অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা এই গবেষণাপত্রে করা হয়েছে। বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক অস্থির অবস্থায় এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের অগ্রগতির পর্যায়ে রাজা নরেন্দ্রলাল খানের আবির্ভাব ঘটে। শুধুমাত্র নাড়াজোল নয়, তৎকালীন অবিভক্ত মেদিনীপুরের এবং বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সদর শহর মেদিনীপুরের শিক্ষার বিকাশে ও জনহিতকর কর্মে রাজা নরেন্দ্রলাল খানের নাম অগ্রগণ্য।

গবেষণার ক্ষেত্রসীমা নির্ধারণ

"বাংলার জমিদারঃ নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খান ও তাঁর কার্যাবলী (১৮৬৭-১৯২০ সাল)" শীর্ষক তত্ত্বালোচনাটি মূলত বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার প্রায় মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ঘাটাল মহকুমার নাড়াজোল নামক জনপদকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। তবে নাড়াজোলের জমিদার পরিবারের সঙ্গে কর্ণগড়ের তথা মেদিনীপুরের জমিদারীর আত্মীয়তার

সম্পর্ক এবং বিশেষত আলোচ্য সময়কালে মেদিনীপুরের জমিদারী নাড়াজোল রাজের অন্তর্ভূক্ত থাকায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নাড়াজোল ও মেদিনীপুরের ইতিহাসে রাজা নরেন্দ্রলাল খানের কার্যাবলী ও অবদান বিষয়টি আমার গবেষণার আলোচ্য ক্ষেত্র।

পুস্তক পর্যালোচনা

মেদিনীপুরের ইতিহাস সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও গবেষণাপত্র রয়েছে, যেগুলি থেকে জেলায় সংগঠিত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, নারী আন্দোলন, ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা এবং আর্থ-সামাজিক বিষয় সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়।

নরেন্দ্রনাথ দাসের লেখা "History of Midnapore (1760-1942)", vol-I, প্রকাশক Gita Das, Midnapore, 1956 এবং "History of Midnapore- Political", vol-II, প্রকাশক Medinipur Itihas Rachana Samity, 1972 বই দুটি থেকে মেদিনীপুর সম্পর্কীত সামগ্রিক বিবরণ পাওয়া যায়। যোগেশচন্দ্র বসুর লেখা "মেদিনীপুরের ইতিহাস" বইটির প্রথম প্রকাশ ১৯২৯ সাল, এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩৯ সাল, প্রকাশক সেন ব্রাদার্স এন্ড কোং, কলিকাতা। ২০১০ সালে অন্নপূর্ণা প্রকাশনী , কলিকাতা থেকে বইটির অখন্ড সংস্করণ প্রকাশ হয়। বসন্ত কুমার দাস রচিত দুই খন্ডে প্রকাশিত "স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর" বইটির ভূমিকা নীহার রঞ্জন রায় ও মুখবন্ধ তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের মন্ত্রী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় রচনা করেছেন।

ঐতিহাসিক শিরিন আখতার এর "The Role of the Zamindars in Bengal 1707-1772" বইটি ঢাকার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত। মুঘল আমলে জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব এবং তারপর শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকার বিষয়টি তাঁর লেখাতে প্রাধান্য পেয়েছে। অর্থাৎ জমিদারী ব্যবস্থার প্রাথমিক পর্বের ধারণা তাঁর বই থেকেই পাওয়া যায়। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ অ্যান্ড কালচার থেকে বিমল চন্দ্র দত্ত র লেখা "বাংলার খেতাবী রাজ-রাজড়া" বইটি ১৯৯২ সালের ১৫ই আগস্ট প্রকাশিত হয়েছে। বইটিতে বাংলার উল্লেখযোগ্য জমিদার বংশগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের দুই উল্লেখযোগ্য জমিদারবংশ – কর্ণগড় ও নাড়াজোলের জমিদারদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থের লেখা ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত "দাসপুরের ইতিহাস" এবং ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত "ঘাটালের কথা" বইদুটি থেকে নাড়াজোল ও সেখানকার জমিদার বংশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

অধ্যাপক শ্যামাপদ ভৌমিকের লেখা "বৈচিত্র্যময় মেদিনীপুরের ইতিহাস" বইটি সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে মেদিনীপুরের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে আঞ্চলিক ইতিহাসের একটি নতুন দিককে সূচিত করে। বইটিকে মূলত কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন হিসাবেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। Dr. Pranab Kumar Mukherjee সম্পাদিত "Midnapur's Tryst With Struggle" বইটিতে নির্দিষ্ট কিছু লেখ্যাগারের তথ্যের সমন্বয় করা হয়েছে।

কমল চৌধুরী সম্পাদিত "মেদিনীপুরের ইতিহাস" গ্রন্থটি ২০০৮ সালে দে'জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত। অধ্যাপক গৌরীপদ চট্টোপাধ্যায় এর গবেষণামূলক গ্রন্থ " Midnapore : The forerunner of Indian Freedom Struggle" ১৯৮৬ সালে দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয়। বইটিতে ১৭৮৩-১৮৬৬ সালের মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় কৃষিক্ষেত্রে অস্থিরতা এবং রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। অধ্যাপক প্রণব রায় ও বিনোদশঙ্কর দাসের সম্পাদনায় "মেদিনীপুরঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন" গ্রন্থটি মোট পাঁচটি খন্ডে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থগুলিতে শুধুমাত্র অখন্ড মেদিনীপুর জেলার সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় তাই নয়, দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনে মেদিনীপুর জেলার ভূমিকা কিরূপ ছিল, তা আলোচিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, মেদিনীপুর সম্পর্কে গবেষণা করতে গেলে বইটি একটি আকর গ্রন্থস্বরূপ। হরিসাধন দাসের লেখা "মেদিনীপুর সম্পদ" বইটি ১৯৯৭ সাল নাগাদ মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বইটিতে মেদিনীপুর সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা পাওয়া যায়। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে বিবর্তনের পর্যায়ক্রমিক বিবরণ জানার জন্য এই বইটি গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য সমন্বিত বইটি থেকে মেদিনীপুরের সামগ্রিক ইতিহাসের একটি সাধারণ ধারণা পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক চিত্তব্রত পালিতের লেখা "Tensions in Bengal Rural Society : Landlords, Planters and Colonial Rule 1830-1860" বইটি থেকে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে বাংলার কৃষক সমাজ ও জমিদার শ্রেণী সম্পর্কে জানতে পারা যায়। শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখা "বাংলাদেশের ইতিহাস" শীর্ষক তিন খন্ডে প্রকাশিত বইটির তিনটি খন্ডে উনিশ শতকের আলোকে সামগ্রিক বাংলাদেশের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে।

Chitta Panda র গবেষণামূলক গ্রন্থ Oxford University South Asian Studies Series থেকে "The Decline of the Bengal Zamindars, Midnapore 1870-1920", Publication : Oxford University Press, Delhi, 1996 প্রকাশিত হয়েছে। জমিদারদের Revenue সংগ্রহ বিষয়ক বিবরণ ও তাদের অভ্যন্তরীন সংকট, যা তাদের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল, সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে এই বইতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উক্ত সময়কালে মেদিনীপুরের কৃষক সম্প্রদায়ের ও জমিদারদের অবস্থা এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেকার সম্পর্কের বিবর্তন বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়া ১৮৮৫ সালের The Bengal Tenancy Act সম্পর্কিত বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে।

Syed Rashed Ali -র "Midnapore District : Company, Raiyats & Zamindars 1780-1885" বই টি ২০০৮ সালে কে পি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বইটিতে মেদিনীপুরের রায়ত, জমিদার ও জোতদারদের মধ্যেকার সম্পর্ক বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। গ্রন্থটিতে মূলত আলোচ্য সময়কালে ভূমি রাজস্ব প্রশাসন বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ, জমিদার শ্রেণী ও ইংরেজ প্রশাসনের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে। এছাড়া, গবেষক মঙ্গল কুমার নায়কের "স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুরের জমিদার শ্রেণীর ভূমিকা, ১৯০০-১৯৪২" শীর্ষক অপ্রকাশিত গবেষণাপত্রটিতে মূলত ইংরেজ শাসনকালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান ক্ষেত্র বাংলার একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের জমিদার শ্রেণীর ভূমিকা বিষয়টি আলোচনায় স্থান পেয়েছে। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জমিদার শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া ও বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনে

বিপ্লবের ক্ষেত্র মেদিনীপুরের প্রাদেশিক শাসকবৃন্দের ভূমিকার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মেদিনীপুরে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ও পরিচালনকারী জমিদারদের মধ্যে নাড়াজোলের খান পরিবারের নাম উল্লেখযোগ্য। তাই তাঁর গবেষণাপত্রের মুখ্য অংশ জুড়েই রয়েছে নাড়াজোলের রাজাদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সম্পর্ক কিভাবে পরিবর্তিত ও পরিচালিত হয়েছে।

মেদিনীপুর জেলার জমিদার সংক্রান্ত শেষোক্ত গবেষণাপত্রগুলি ছাড়া অন্য কোন ধরণের গবেষণা এখনও পর্যন্ত হয়নি। আবার বিশেষ কোন জমিদার বংশ ও নির্দিষ্ট কোন জমিদার সম্পর্কিত গবেষণা প্রায় নেই বললেই হয়। ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত নীলমণি মুখার্জীর লেখা "A Bengal Zamindar : Joykrishna Mukherjee of Uttarpara and his times" বইটিতে জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখার্জী সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

গবেষণা পদ্ধতি

"বাংলার জমিদারঃ নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খান ও তাঁর কার্যাবলী (১৮৬৭-১৯২০ সাল)" বিষয়টি সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোন ধরণের গবেষণা, বইপত্র অথবা পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। এই গবেষণাপত্রটিতে সমকালীন সময়ের সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলের আলোকে নাড়াজোল ও মেদিনীপুরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজা নরেন্দ্রলাল খানের অবদান সম্পর্কে একটি বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। এই

কাজটির জন্য যে সব স্থানে অনুসন্ধান করা হয়েছে তা হল রাজ্য লেখ্যাগারে রক্ষিত সরকারী দলিলপত্র, সংবাদপত্র, ক্ষেত্র সমীক্ষা করা এবং ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করা হয়েছে।

অধ্যায় পরিকল্পনা

উক্ত গবেষণামূলক নিবন্ধকে তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। এই তিনটি অধ্যায় এর মাধ্যমে এই গবেষণাটি সুস্পষ্ট আকৃতি পায়।

প্রথম অধ্যায়টির নামকরণ করা হয়েছে 'জমিদারবংশের ইতিবৃত্ত'। আলোচ্য অধ্যায়টিকে নাড়াজোল রাজপরিবারের রাজকীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিক বিবরণ বলা যেতে পারে। নাড়াজোল রাজবংশের বংশবিবরণী অনুযায়ী সুলতানী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটি অন্যতম প্রাচীন রাজবংশ হল এই নাড়াজোল জমিদার বংশ তথা খান বংশ। তবে এঁদের নামের শেষে 'খান' উপাধি যুক্ত হয়েছিল অনেক পরে। এই বংশের প্রথমদিকের যে রাজপুরুষের কথা জানা যায় তিনি হলেন উদয়নারায়ণ ঘোষ। জঙ্গলাকীর্ণ এই অঞ্চলের অধিপতি হিসেবে তিনি নিজের স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিলেন। এরপর প্রায় ২৫০-৩০০ বছর ধরে এই রাজবংশ অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে নিজেদের স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।তারপর তাঁর উত্তরসূরীরা এই অঞ্চলকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে আলোচিত হয়েছে রাজা নরেন্দ্রলাল খানের রাজনৈতিক কার্যাবলি। সেই সময়ে যখন সমগ্র বাংলা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উত্তাল, ঠিক সেই সময়ে

মেদিনীপুরের স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উত্থান ঘটে রাজা নরেন্দ্রলাল খানের। প্রকৃতপক্ষে তাঁর আগে অপর কোন খান বংশীয় জমিদার এতটা সক্রিয়ভাবে তৎকালীন ব্রিটিশ বিরোধিতায় লিপ্ত থাকেন নি। তিনি রাজনীতিতে সম্মুখ আন্দোলন করার সপক্ষে ছিলেন না। কিন্তু তাঁর মতাদর্শ তাঁকে স্বদেশীদের অর্থ সাহায্যের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। আচার-ব্যবহারে ও আদর্শে তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষেই স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয়। তাঁর স্বদেশী চিন্তাধারা সর্বদা তাঁকে এক নতুন দিকে পরিচালিত করেছিল। তাঁর কর্মমুখর বর্ণময় জীবন একদিকে যেমন অসাধারণ প্রজ্ঞা ও সাংস্কৃতিক চেতনার পরিচায়ক, তেমনি আবার অন্যদিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর বৈপরিত্যের সমন্বয় তাঁকে একজন কূটকৌশলী রাজপুরুষে পরিণত করেছিল।

তৃতীয় অধ্যায়টিতে আলোচিত হয়েছে রাজা নরেন্দ্রলাল খানের সমাজসেবা ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলী। স্বদেশী শিল্পের প্রসার করা, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়ন সহ জেলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর পরিশিলিত পদচারণা ঘটেছিল। জনহিতৈষণা ও জনসেবামূলক কাজকর্মের ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টার কখনো বিরাম ছিল না। সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে শিক্ষার ভূমিকা অসামান্য তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, যার ফলশ্রুতি হল এই অঞ্চলে বিদ্যালয় ও পাঠাগারে তাঁর অকৃপণ অর্থসাহায্য। লোকশিল্পের বিস্তার, লোকশিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা, উক্ত অঞ্চলে সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সত্যই প্রশংসনীয়। সাধারণ লোকহিতকর কার্যে ও দানধ্যানের বিষয়ে তাঁর মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া সঙ্গীত চর্চা ও সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অস্বীকার করা যায় না।

অতীতের যে গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ছিলেন এই রাজবংশ তা রাজা নরেন্দ্রলাল খানের সময় থেকেই এক অন্য মাত্রা পায়। মোহনলাল খানের সময় থেকে স্থাপত্য বিষয়ে যে অগ্রগতির সূচনা হয়, সহৃদয় অযোধ্যারামের সময়ে তা দানকর্ম ও প্রজাহিতৈষণাতে পরিণত হয়। তারপর মহেন্দ্রলাল খানের সময়ে শুধুমাত্র দান বা প্রজাহিতৈষণাই নয়, সুলেখক ও সংস্কৃতিমনস্ক রাজার প্রত্যক্ষ আনুকূল্যে এই অঞ্চলটিতে সংস্কৃতিচর্চা, লোকহিতকর কার্য ও দান-ধ্যান এক অন্য মাত্রা পায়। রাজা মহেন্দ্রলাল খানের পরে তাঁর পুত্র রাজা নরেন্দ্রলাল খান এই বংশকে শুধু মেদিনীপুরের ইতিহাসে নয়, বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানকারী জমিদার শ্রেণীর মধ্যে অগ্রগণ্য হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তবে স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ভূমিকার উল্লেখ করলেই যে তাঁর চরিত্র ও কর্মকান্ডের সঠিক মূল্যায়ন করা যাবে না। তাঁর জনহিতৈষণামূলক কাজের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রলাল খানকে তিনি উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। তবে বলা যেতে পারে যে, জমিদারী ব্যবস্থার প্রতি গৃহীত নীতি নাড়াজোল রাজবংশকে এরপর থেকেই অস্তিত্ব বজায় রাখার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রাজ অধিকার বিলুপ্ত হবার পরে নাড়াজোল সংস্কৃতির স্বকীয়তা হ্রাস পেতে থেকে।

জমিদারবংশের ইতিবৃত্ত

জমিদারীর অবস্থান

নাড়াজোল অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পূর্বে এবং ঘাটাল মহকুমার পশ্চিম অংশে অবস্থিত। নাড়াজোল ২২°৩৪'৪" উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৭°৩৯'৪" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।[১] নাড়াজোলের উত্তরে ঘাটাল থানা, দক্ষিণে ডেবরা থানা ও পশ্চিমে কেশপুর থানা। নাড়াজোল পূর্বে পরগণা কুতুবপুরের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু পরে এটি একটি আলাদা পরগণা হিসাবে পরিচিতি লাভ করে, যার নাম হয় "Tuppa Narajole"। এটি তিরিশটি বড় এবং দশ টি ছোট গ্রাম নিয়ে গঠিত ছিল। নাড়াজোলের উত্তরে ব্রাহ্মণভূম, বরদা ও চন্দ্রকোণা পরগণা, পশ্চিমে ব্রাহ্মণভূম, ভঞ্জভূম বা মেদিনীপুর, দক্ষিণে পরগণা কুতুবপুর এবং পূর্বে পরগণা চেতুয়া অবস্থিত।[২]

নাড়াজোল গ্রাম ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত, শিলাবতী বা শিলাই নদীর দক্ষিণ তীরে এবং কেশপুরের এগারো মাইল পূর্বে অবস্থিত। এটি নাড়াজোল রাজের প্রধান কেন্দ্র এবং মেদিনীপুরের বড় বড় জমিদারীগুলির মধ্যে অন্যতম।[৩] ১৮৭২ সালের সেন্সাস অনুযায়ী এই অঞ্চলের আয়তন ছিল ৮৯৯৭ একর বা ১৪.০৫ বর্গমাইল। মোট ৭১ টি গ্রাম নিয়ে পরগণাটি গঠিত ছিল।[৪] উইলিয়াম হান্টার তাঁর গ্রন্থে বলেছেন এটি একসময় সুতিবস্ত্র উৎপাদনের প্রধান

[১] রায় পঞ্চানন ও রায় প্রণব, ঘাটালের কথা, পৃঃ ৯৩

[২] Khan, Rajah Mohendro Lall, History of the Midnapore Raj, 1889,Calcutta, Thacker, Spink and Co., p-31

[৩] O'Malley, L.S.S., Bengal District Gazetteers : Midnapore, Calcutta, The Bengal Secretariat Book Depot, 1911, p-212

[৪] রায়, পঞ্চানন, প্রাঃ উক্ত, পৃঃ ৯৩

কেন্দ্র ছিল।[৫] তবে শুধুমাত্র বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে নয়, বিভিন্ন কুটির শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

জাতিপরিচয়

নাড়াজোলের খান বংশ সদ্‌গোপ সম্প্রদায়ভুক্ত। জেলার প্রাচীনতম অধিবাসীদের মধ্যে এই সম্প্রদায় অগ্রগণ্য। অন্যান্য বর্ণের কৃষকদের মধ্যে তাদের স্থান সবার উপরে। স্থানীয় লোককথা অনুসারে এই জেলায় প্রথম সদ্‌গোপ পরিবার এসে বসবাস করতে শুরু করে নারায়ণগড় থানা অঞ্চলে। এরা নিজেদের বৈশ্য হিসাবে দাবি করলেও মূলত এঁরা ছিলেন গোয়ালাদের একটি উপশাখা, যারা পেশা বা বৃত্তি হিসাবে কৃষিকাজ গ্রহণ করেছে। গোষ্ঠী হিসাবে এঁরা ছিলেন তুলনামূলকভাবে সঙ্গতিসম্পন্ন। আবার এই আলোচ্য অঞ্চলটির জমিদার যেহেতু সদ্‌গোপ বংশীয়, সেহেতু এই অঞ্চলে তাঁদের একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল।

বংশানুক্রমিক বিবরণ

নাড়াজোলের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে উদয়নারায়ণ ঘোষকে মনে করা হয়। তাঁকে অনেকে বর্ধমানরাজের কর্মচারী বলেও মনে করেছেন। যদিও এই বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। অরণ্যাবৃত নাড়াজোলে আদিম জনজাতির আদি নিবাস ছিল। উদয়নারায়ণের আগমনকে কেন্দ্র করে প্রাচীন এক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। উদয়নারায়ণ শিকারের খোঁজে এই অঞ্চলে প্রবেশ করেন এবং শিকার করতে করতে গভীর জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেন। সন্ধের সময় তিনি এক অলৌকিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। একটি বক বাজপাখিকে আক্রমণ

[৫] Hunter, W.W., Statistical Account of Bengal, vol-III, District of Midnapur and Hugli,1876, pp-46

করেছে এবং সেই স্থানটি অনির্বচনীয় আলোয় ভরে উঠেছে। রাত্রে উদয়নারায়ণ দেবী দুর্গার স্বপ্নাদেশ পান এবং সেই স্থান থেকেই দেবী জয়দুর্গার সোনার মূর্তি ও প্রচুর ধনসম্পদ লাভ করেন। এরপর উদয়নারায়ণ নদ-নদী কেন্দ্রিক এই ভূখন্ডে নিম্নবর্গের জনজাতির অধীশ্বর হয়ে বসতি স্থাপন করেন। পরে উদয়নারায়ণ তাঁর স্বজাতীয় কিছু পরিবারকে বর্ধমান থেকে নিয়ে এসে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। এভাবেই তারই প্রচেষ্টায় নাড়াজোলের বনভূমি বাসভূমিতে পরিণত হয়।

উদয়নারায়ণের পরে তাঁর পুত্র প্রতাপনারায়ণ এই অঞ্চলের অধিপতি হন। প্রতাপনারায়ণের পরে তাঁর পুত্র যোগেন্দ্রনারায়ণ নাড়াজোলের খান পরিবারের পরবর্তি রাজপুরুষ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি নাড়াজোলের গড়টির পরিকল্পনা করেন। যোগেন্দ্রনারায়ণের পুত্র ভরতনারায়ণ কৃষিকার্যের সুবন্দোবস্ত করেন। ভরতনারায়ণের পুত্র কার্তিকরাম ঘোষ নাড়াজোলের জমিদারী সুবিস্তৃত করেন। বাংলার তৎকালীন অধীশ্বর সোলেমান কররাণির কাছ থেকে কার্তিকরাম ঘোষ ‘‘রায়’’ উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ‘বলবন্ত খান’ উপাধি লাভ করেন। কুতুবপুর পরগনা থেকে গৃহীত চল্লিশ মৌজা সমন্বিত নাড়াজোল পরগনা এঁদের পৈতৃক জমিদারী ছিল।[৬] তারপর থেকেই নাড়াজোলের জমিদারেরা ‘রায়’ পদবি ব্যবহার করতে শুরু করেন। কার্তিকরামের পরে জয়মণি রায় ও শ্যামসিংহ রায় এই অঞ্চলকে জনপদে পরিণত করেন। এবং শ্যামসিংহ রায় এই অঞ্চলের সীমানা গ্রামে ‘‘ফতেগড়’’ নামে একটি গড় নির্মাণ করেন।[৭]

[৬] Khan, Rajah Mohendro Lall, Ibid, pp. 31

[৭] দেবাশিষ ভট্টাচার্য, ‘‘নাড়াজোলঃ এক অনন্য জনপদ’’, পৃঃ ১৬৮

১৫৯৬ খ্রিষ্টাব্দে বলবন্ত রায় তদানীন্তন বাংলার নাজিমের কাছ থেকে "খান" উপাধি লাভ করেন। মহেন্দ্রলাল খান তাঁর বইতে লিখেছেন, "The title of Khan was obtained from Nawab Nazim of Bengal".[৮] বলবন্তের পরে জমিদার হন গুণবন্ত খান। গুণবন্তের পরে মহেশচন্দ্র খান নাড়াজোলের জমিদার হন। তাঁর রাজত্বকাল ১৬৫৫-১৬৮৬ সাল। ১৬৮৭ সাল থেকে ১৭১৭ সাল পর্যন্ত নাড়াজোলের জমিদার ছিলেন অভিরাম খান। অভিরাম খানের তিন পুত্র – যদুরাম খান, সভারাম খান ও ত্রিলোচন খান। এই বংশে জ্যেষ্ঠর অধিকার প্রথা প্রচলিত থাকায় যদুরাম নাড়াজোলের জমিদার হন। সভারাম ও ত্রিলোচন খান অগ্রজকে জমিদারীর কাজে সহযোগিতা করতেন। যদুরামের রাজত্বকাল ১৭১৯ - ১৭৪৫ সাল, মাত্র চব্বিশ বছর। যদুরামের পরে তাঁর পুত্র মতিরাম খান রাজ্যাধিকার লাভ করেন। তাঁর সময়কাল ১৭৪৬-১৭৫১ সাল, মাত্র পাঁচ বছর। অপুত্রক অবস্থায় মতিরাম খান পরলোকগমন করলে যদুরামের মধ্যম ভ্রাতা সভারামের জ্যেষ্ঠ পুত্র সীতারাম খান নাড়াজোলের অধিপতি হন। সীতারাম জমিদারীর কাজে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মূলত, তাঁর সময়কালেই নাড়াজোলের জমিদারীর প্রকৃত উন্নতি ঘটে। মহেন্দ্রলাল খান লিখেছেন, "Wickermen or Domes and even Mussulmans were formmerly allowed to reside in the Gar as eyots, on condition of doing military service on the Khan family at the time of any exigency or foreign attack especially that of the Mahrattas.....".[৯]

সীতারাম খানের কার্যকাল ১৭৫২-১৭৮৪ সাল। এই সময় শুধুমাত্র মেদিনীপুরের ইতিহাসে নয়, সারা বাংলার ইতিহাসে এক সংকটকাল রূপে পরিগণিত। ১৭৫১ সালে মারাঠাদের সঙ্গে বাংলার নবাব আলিবর্দির যে সন্ধি হয়েছিল সেই সন্ধির শর্ত এক বছর পার হবার পরেই মারাঠাদের সেনাপতি শ্রীভট্ট মেদিনীপুরে প্রবেশ করে সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরী

[৮] Khan, Rajah Mohendro Lall, Ibid, pp. 31

[৯] Ibid, pp- 64

করেছিলেন। ১৭৬৯-১৭৭০ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষে তথা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে মেদিনীপুরের অধিকাংশ অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়েছিল। আবার এই সময়েই মেদিনীপুরের শাসনভার ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গ্রহণ করার ফলে কোম্পানীর আর্থিক শোষণ তীব্র হয়ে ওঠে। বলা যেতে পারে, মেদিনীপুরের বিভিন্ন জমিদারীর রাজস্ব প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পায়। কোম্পানী নাড়াজোলের বর্ধিত রাজস্ব বাবদ ১৩ হাজার ৩ শত ৩৩ টাকা ১০ আনা সীতারাম খানের কাছে দাবী করেন। সীতারাম খান বর্ধিত রাজস্ব দিতে অস্বীকার করেন। তার ফলে তাঁর জমিদারীর যে সব অংশ দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ছিল সেইগুলি ছাড়া সমস্ত সম্পত্তি কোম্পানী খাস বলে ঘোষণা করে। ১৭৮৪ সালের মার্চ মাসে সীতারাম খান পরলোকগমন করেন।

সীতারাম খানের তিনপুত্র – আনন্দলাল খান, নন্দলাল খান ও মোহনলাল খান। সীতারামের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র আনন্দলাল পৈতৃক জমিদারী রক্ষা করার জন্য কোম্পানীর বর্ধিত রাজস্ব পরিশোধ করে নাড়াজোলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অন্যদিকে নাড়াজোলের নিকট আত্মীয় কর্ণগড়ের জমিদারীও বাজেয়াপ্ত হয় বর্ধিত রাজস্ব শোধ করতে না পারার কারণে। সে সময়ে কর্ণগড়ের মেদিনীপুরের শাসনভার ছিল রাজা যশোবন্ত সিংহের পুত্রবধূ এবং অজিত সিংহের পত্নী রাণি শিরোমণির তত্ত্বাবধানে। আনন্দলাল খানের পিতৃব্য চুনিলাল খান ছিলেন যশোবন্ত সিংহের মামাতো ভাই। ১১৫৫ বঙ্গাব্দে যশোবন্ত সিংহের এবং তারপর ১১৬২ বঙ্গাব্দে (১৭৫৫ সালে) তাঁর পুত্র অজিত সিংহের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হয়। আবার ঠিক এই সময়ই ১৭৬০ সালে চুয়াড় বিদ্রোহের ফলে মেদিনীপুরে অশান্তির বাতাবরণ তৈরী হয়েছিল। এই চুয়াড়দের প্রতিরোধ করার জন্য মৃত অজিত সিংহের দুই রানি -রানি ভবানী ও রানি শিরোমণি

"রানি পাটনা" নামক স্থানে ত্রিলোচন খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দুইজনের মধ্যে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।[১০] সেই চুক্তিপত্রের শর্তগুলি ছিল নিম্নরূপঃ

১। বাবু ত্রিলোচন খান চুয়াড়দের দমন করবেন।

২। রানিদের জীবদ্দশায় ত্রিলোচন খান নায়েব রূপে মেদিনীপুরের জমিদারীর তত্ত্বাবধান করবেন।

৩। রানিদের মৃত্যুর পরে ত্রিলোচন খান বা তাঁর উত্তরাধিকারীরা মেদিনীপুর রাজ্যের অধীশ্বর হবেন।

এই সময়ের মধ্যেই চুয়াড়সর্দার গোবর্ধন দিকপতির নেতৃত্বে চুয়াড়রা বা পাইকেরা রানিদের মেদিনীপুর জমিদারী অধিকার করে ফেলে। এই চুক্তির পরে ত্রিলোচন খান প্রবলভাবে চুয়াড়দের প্রতিরোধ করেন এবং ত্রিলোচন খান মেদিনীপুর জমিদারির তত্ত্বাবধায়ক হয়েছিলেন। ১১৬৭ বঙ্গাব্দে কর্ণগড়ের রানি ভবানী পরলোক গমন করেন। এর কিছুদিন পরে ত্রিলোচন খানের মৃত্যু হয়। ত্রিলোচন খানের মৃত্যুর পরে কর্ণগড়ের তত্ত্বাবধায়ক হন ত্রিলোচন খানের জ্যেষ্ঠ অগ্রজ যদুরামের পুত্র মতিরাম খান। মতিরাম খান ১৭৬১ সালে পরলোক গমন করেন। মতিরামের পরে সভারামের দ্বিতীয় পুত্র চুনিলাল খান কর্ণগড়ের রানি শিরোমণির প্রধান সহায়ক হয়ে ওঠেন।

১৭৮৮ সালে দ্বিতীয় চুয়াড় বিদ্রোহকে সমর্থন করার অভিযোগে রানী শিরোমণিকে বন্দি করার জন্য ইংরেজ সরকার কর্ণগড়ে সেনা প্রেরণ করেন। ইংরেজ সেনারা অবাধে লুণ্ঠন করে

[১০] Ibid, pp. 4

শিরোমণি ও চুনিলাল খানকে বন্দি করে আবাসগড় দুর্গে আটক করে রাখেন। পরে কলকাতায় প্রেরণ করেন। আবাসগড় দুর্গে বন্দি থাকাকালীন ইংরেজ সেনানায়কের সহযোগিতায় নাড়াজোলের জমিদার আনন্দলাল খান তাঁর পিতৃব্য চুনিলাল খান ও রানি শিরোমণির সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পান। চুনিলাল খান ও শিরোমণিকে কলকাতায় পাঠানোর পরে আনন্দলাল খান তাঁদের বন্দিত্ব মোচন করার চেষ্টা করেন। পুত্রসম আনন্দলাল রানি শিরোমণি ও চুনিলাল খানকে নিরপরাধ প্রমাণ করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৭৯৯ সালে সদর নিজামত আদালতের বিচারে রানি শিরোমণি ও চুনিলাল মুক্তিলাভ করেন। ইংরেজরা কর্ণগড় থেকে বাজেয়াপ্ত করা কিছু জিনিস রানীকে ফিরিয়ে দেন।

এরপরে রানি শিরোমণির অধিকৃত অঞ্চলের রাজস্ব ইংরেজ সরকার বৃদ্ধি করলে রানি সেই রাজস্ব দেওয়া অসম্ভব বলে জানায়। ইংরেজ সরকার রানি শিরোমণি কর্তৃক প্রদত্ত রাজস্বের পরিমাণ কমিয়ে ৮৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করেন। রানি শিরোমণি এই টাকা দিতেও অস্বীকার করেন। ১৮০০ সালের ৩০ শে জুন রানি শিরোমণি মেদিনীপুরের জমিদারী রাজা আনন্দলাল খানকে দানপত্র করলেন। সেই দানপত্র ১৮০০ সালের ৩০ শে জুলাই রেজিষ্ট্রি করা হয়। এই দানপত্রের ফলেই আনন্দলাল খান কর্ণগড় ও নাড়াজোল উভয় জমিদারীর মালিক হন। ১৮০৫ সাল পর্যন্ত কোন অসুবিধা ছাড়াই ভালভাবে আনন্দলাল জমিদারী চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৮০৬ সালে রানি শিরোমণি পুনরায় তাঁর জমিদারী ফিরে পাওয়ার জন্য মামলা দায়ের করেন। এই মামলা শেষ হবার আগেই আনন্দলালের মৃত্যু হয়।[১১]

[১১] Ibid, pp. 5-6

আনন্দলালের অপুত্রক ছিলেন। তাই মৃত্যুর পূর্বে আনন্দলাল দুটি দানপত্র করেন। প্রথম দানপত্রে মেদিনীপুর জমিদারীর চারটি পরগণা কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোহনলাল খানকে আর দ্বিতীয় দান পত্রে পৈতৃক সম্পত্তি নাড়াজোল জমিদারী মধ্যম ভ্রাতা নন্দলাল খানকে দিয়ে যান। মোহনলাল খান মেদিনীপুরের জমিদারীর সত্ত্বাধিকারী হওয়ায় রাণি শিরোমণির দায়ের করা মামলায় মোহনলাল খানকে প্রয়াত আনন্দলাল খানের পক্ষভুক্ত করে নেওয়া হয়। ১৮১১ সালে নিম্ন আদালতে বিচারের পরে শিরোমণি দেওয়ানী আদালতে আপিল করেন। আপিলে শিরোমণির জয় সুনিশ্চিত হয়।

মোহনলাল খান এই রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন করেন। মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত রানির সম্পত্তি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের হাতে মেদিনীপুরের কালেক্টরের অধীনে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৮১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিদ্রোহিনী রানি শিরোমণি পরলোকগমন করেন। রানির মৃত্যুর পর অজিত সিংহের এক দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি কন্দর্প সিংহ এক "হোবানামা" দাখিল করে মেদিনীপুরের চার পরগণার অধিকার দাবি করেন। তিনি যে "হোবানামা" দাখিল করেন সেই হোবানামা রানির মৃত্যুর আগের দিন লেখা হয় বলে প্রমাণিত হয়। ১৮১২ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর কালেক্টর দুই পক্ষকেই দাবির উপযুক্ত প্রমাণ সহ আবেদন করতে বলেন। উভয় পক্ষের আবেদন নিয়ে ১৮১৩ সালের ২৪ শে ডিসেম্বর ঘোষিত রায় অনুযায়ী মেদিনীপুরের জমিদারীতে খান পরিবারের অধিকার স্বীকৃত হয়।

জেলা কালেক্টরের সিদ্ধান্ত সদর দেওয়ানি আদালতে প্রেরণ করা হলে সদর দেওয়ানি আদালতের বিচারকেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, মেদিনীপুর জমিদারীতে কোর্ট অফ অয়ার্ডসের আর কোন অধিকার থাকতে পারে না। মোহনলাল খান জামিন দিয়ে মেদিনীপুরের সম্পত্তি

দখল করতে পারেন। এই রায়ের প্রেক্ষিতে মোহনলাল খান জমিদারীর দখল নিলেন। এটি আইনগত ভিত্তি পেল যখন ১৮২৭ সালের ৩ রা ডিসেম্বর প্রিভি কাউন্সিল মোহনলাল খানকে জমিদারীর যোগ্য উত্তরসূরী হিসাবে ঘোষনা করে। প্রিভি কাউন্সিলের মেদিনীপুরের রাজবংশকে সদগোপ ব্রাহ্মণ বলে উল্লেখ করেছিলেন। মেদিনীপুর রাজবংশ বাংলার সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন।

মোহনলাল খানের সময় থেকেই নাড়াজোলের শিল্প-স্থাপত্যের ইতিহাস শুরু হয়। তাঁর আমলে তৈরী স্থাপত্য কীর্তিগুলিগুলিতে ইন্দো-ইউরোপীয় রীতির এক অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। পুকুর খনন, মঠ নির্মাণ, মন্দির তৈরী প্রভৃতিতে মোহনলাল খানের শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর জনহিতৈষণামূলক কাজ তাঁকে নাড়াজোলের ইতিহাসে এক অনন্য স্থান দিয়েছে। তাঁর ছয় পুত্র – অযোধ্যারাম, জয়রাম, ব্রজকিশোর, রামচন্দ্র, হৃদয়রাম ও রামকমল। ১৮৩০ সালে বাংলার ১২৩৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে শ্বাসকষ্টজনিত কারণে মোহনলাল খান মারা যান। তাঁর মৃত্যুর সময়ে তাঁর পুত্ররা ছিলেন নাবালক। তাই তিনি এক দানপত্রের মাধ্যমে জ্যেষ্ঠ পুত্র অযোধ্যারাম খানকে জমিদারীর অধিকার দিয়ে দুই রানি কুন্দলতা ও রঙ্গলতা কে অভিভাবক ও পিতৃব্য চুনিলাল খানকে জমিদারীর দায়িত্ব দেন। কিছুদিন পরেই চুনিলাল খান পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শ্রীমন্তলাল খান রানিদের অনুমতিক্রমে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। এরপর জমিদারীর অংশীদারিত্ব নিয়ে দুই রানির মধ্যে গৃহবিবাদ শুরু হয় এবং জমিদারীতে অচলাবস্থা দেখা দেয়। চার বছর ধরে নাড়াজোল জমিদারীতে জটিলতা চলার পরে ১৮৩৬ সালে সরকারী রাজস্ব বাকি পড়ে এবং সম্পত্তি লাটবন্দি হয়। কোন ক্রেতা না থাকায় সরকার সরাসরি ডাক ১ টাকায় সম্পত্তি ক্রয় করে নেয়। ১৮৩৭ সালে সরকার ২০ বছরের জন্য মেদিনীপুর জমিদারী রবার্ট ওয়াটসন কোম্পানীকে

ব্যবস্থা করে দেয়। রানী কুন্দলতা ও রঙ্গলতা জমিদারীর নিলাম বন্ধ করার আবেদন জানান। ১৮৪০ সালে সরকার নিলাম রদ করে রানিদের জমিদারি ফিরিয়ে দেন।[১২]

রানী রঙ্গলতার পুত্র রামচন্দ্র খান জোর করে পিতার সম্পত্তির অর্ধেকের বেশি অংশ দখল করেন। অযোধ্যারাম রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। ১৮৪০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে আদালত রায় দেয় যে, দুই রানির পুত্রদের মধ্যে সম্পত্তি সমানভাবে ভাগ করে দিতে হবে। অক্টোবর মাসে অযোধ্যারাম খান মেদিনীপুর আদালতে সমগ্র সম্পত্তি লাভের জন্য আবেদন জানান। তিনি তাঁর আবেদনপত্রে জানান যে, রানী শিরোমণির বংশের কুলপ্রথা অনুযায়ী একজনই এই সমগ্র সম্পত্তির অধিকারী। রানী শিরোমণি একজনকেই সম্পত্তির দানপত্র করেন। এছাড়া মোহনলাল খান অযোধ্যারাম খানকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। সেই হেতু তিনিই ছিলেন সম্পত্তির যোগ্য উত্তরাধিকারী। অন্যদিকে রামচন্দ্র খান আদালতে জানান দানের সম্পত্তি কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়, তাই উত্তরাধিকার ব্যাপারে কুলপ্রথা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। জেলা সদরের আমিনের রায় অনুযায়ী যেহেতু আগে জঙ্গলমহল ওয়াটসন কোম্পানীকে ইজারা দেবার সময় উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে দেওয়া হয়েছিল তাই অযোধ্যারাম খানকে একমাত্র অধিকারী বলা যেতে পারে না। অযোধ্যারাম খান সদর আমিনের এই রায়ের বিরুদ্ধে সদর দেওয়ানি আদালতে পুনরায় আপিল করেন। সদর দেওয়ানি আদালত সদর আমিনের রায় বহাল রাখতে অস্বীকার করেন। সদর দেওয়ানি আদালত রায় দেয় যে রাজা অজিত সিংহের পারিবারিক উত্তরাধিকার রীতি অনুযায়ী এই সম্পত্তি বিভক্ত হতে পারে না। আদালতের এই নির্দেশ অনুযায়ী অযোধ্যারাম খান মেদিনীপুর জমিদারির একমাত্র উত্তরাধিকারি হন।

[১২] ভট্টাচার্য, প্রাঃ উক্ত, পৃঃ ১৭৪

অযোধ্যারাম খান যখন নাবালক ছিলেন তখন রানী কুন্দলতা ও রঙ্গলতা বিভিন্ন মামলার জন্য অর্থাভাবের সম্মুখিন হন। তাই বাধ্য হয়ে জমিদারির কিছু অংশ কলকাতার প্রসিদ্ধ ধনপতি আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেবের কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। দীর্ঘদিন রানিরা বন্ধকি ঋণ শোধ করতে পারেন নি। ১৮৪৭ সালে বন্ধকের সীমা অতিক্রান্ত হওয়ায় বন্ধক গ্রহীতারা জন অ্যাবট সাহেবকে জমিদারির অংশ বিক্রি করে দেন। কিন্তু অ্যাবট সাহেব আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেবকে সম্পূর্ণ মূল্য দিতে পারেন নি। কিছু পরিমাণ টাকা দিয়ে অ্যাবট জমিদারি দখল করেন।

পরের বছর ১৮৪৮ সালে নাড়াজোল জমিদারির খাজনা না দেওয়ায় জমিদারি নিলামে ওঠে। তদানিন্তন বাংলার নাজিমের মোক্তার ম্যাক আর্থার সম্পত্তি ক্রয় করে নেন। ইতিমধ্যে অযোধ্যারাম সাবালক হয়ে আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান। সেই কারণেই আর্থার বেশিদিন সম্পত্তি নিজের কাছে না রেখে নাজিমের অন্যতম কর্মচারি সাদাক আলিকে হস্তান্তর করেন। ১৮৬০ সালে অযোধ্যারাম খান জেলা আদালতে আবেদন করেন যে আশুতোষ দেব, প্রমথনাথ দেব এবং মিঃ অ্যাবট ষড়যন্ত্র করে সরকারের কাছে খাজনা বাকি রেখে সম্পত্তি নিলামে তুলেছেন। জেলা আদালতে এই আবেদন খারিজ হয়ে গেলে অযোধ্যারাম খান প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন করেন। প্রিভি কাউন্সিল আবেদন বিচার বিশ্লেষণ করে অ্যাবট, ম্যাক আর্থার ও নবাবের কর্মচারিদের দোষী সাব্যস্ত করে অযোধ্যারাম খানকে সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার নির্দেশ দেন। পরবর্তিকালে এই মামলা আপোষে সমাধান হয়। ১৮৭০ সালে অযোধ্যারাম সম্পত্তির অধিকার ফিরে পান।[১৩] সাধারণ ব্যক্তিবর্গকে দান, ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের

[১৩] Mohendro Lall Khan, History of Narajole Raj , pp. 45-48

সেবা ও প্রজাদের রক্ষা করার ব্যাপারে তিনি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। ১৮৭৭ সালের ১ লা ফেব্রুয়ারীতে মহারানির 'Empress of India' বা 'ভারত সম্রাজ্ঞী' উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে তিনি একটি সম্মানসূচক পত্র পান, যদিও তিনি রাজা উপাধি পান নি।

১৮৭৯ সালের ১৪ ই ডিসেম্বর অযোধ্যারাম খান মারা যান। মৃত্যুর সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। অযোধ্যারাম খানের দুই পুত্র – মহেন্দ্রলাল ও উপেন্দ্রলাল খান। মহেন্দ্রলাল খান যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন বিভিন্ন মামলায় খান পরিবার দুর্দশাগ্রস্ত। পারিবারিক এই দুরবস্থার মধ্যেও মহেন্দ্রলাল খানের শিক্ষার আয়োজন করা হয়। তৎকালীন যুগের উজ্জ্বল ব্যক্তিদের মধ্যে মহেন্দ্রলাল খান ছিলেন উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৮ সালের ৪ ঠা সেপ্টেম্বরে মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট জজের কাছে তিনি 'মেদিনীপুর রাজ' গ্রহণের মানপত্র পান। ১৮৮৭ সালে ১৯ শে ফেব্রুয়ারী মহারানি ভারতেশ্বরীর জুবিলী উপলক্ষে মহেন্দ্রলাল খান 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন।এই উপলক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল মহেন্দ্রলাল খানকে একটি চিঠি দেন।[১৪] ১৮৯২ সালে মহেন্দ্রলাল খান মারা যান।

মহেন্দ্রলাল খানকে ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া চিঠিটি নিচে উল্লেখ করা হলঃ

Belvedere, 19th February, 1887

"Rajah,

It gives me great pleasure to congratulate you on your accession to the title of Rajah which H.E. the Viceroy has been pleased to confer upon you,

[১৪] Ibid, pp.21

in recognition of your public spirit and liberality on many occasions, on the auspicious celebration of Her Majesty, the Queen-Empress's Jubilee in India.

I trust you may be spared many years in the enjoyment of an honor which is appropriate to the representation of a family of ancient lineage.

I am,

Yours sincere friend,

Rivers Thompson

Lieutenant-Governor of Bengal

To,

Rajah Mohendro Lall Khan,

Midnapur.

রাজা নরেন্দ্রলাল খানকে যখন ইংরেজ সরকার গ্রেপ্তার করে তখন অমৃতবাজার পত্রিকায় মহেন্দ্রলাল খানের প্রশংসা করে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যেখানে পূর্বতন লেফটেন্যান্ট জেনারেল স্যার স্টুয়ার্ট বেইলির উদ্ধৃতি উল্লেখিত রয়েছে।[১৫]

মহেন্দ্রলাল খানের পুত্র নরেন্দ্রলাল খান জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৭ সালের ১৭ ই সেপ্টেম্বর।[১৬] নরেন্দ্রলাল খানের জন্মের কয়েকদিন আগে তাঁর পিতামহ অযোধ্যারাম খান সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলায় জয়লাভ করেন। তাই বলা যেতে পারে তাঁর জন্ম যেন খান পরিবারে

[১৫] Amrita Bazar Patrika, Calcutta, September 5, 1908

[১৬] প্রণব রায়, "মেদিনীপুরঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন", ৪ র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০২

সৌভাগ্যের সূচনা করেছিল। নরেন্দ্রলাল খান যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন খান বংশের আর্থিক দুর্দশার চিহ্নমাত্র ছিল না। তাই তাঁকে কোনো দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয় নি। তাই বলা যেতে পারে যে, নরেন্দ্রলাল খানের জন্ম যেন নাড়াজোল রাজ পরিবারে সুখের বার্তা নিয়ে এসেছিল। পিতার তত্ত্বাবধানে ও গৃহশিক্ষকের কাছে তিনি সংস্কৃত, ফার্সী ও ইংরেজি ভাষায় তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় প্রায় সবসময়ই তিনি নাড়াজোলেই থাকতেন।উদ্দেশ্য, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী হওয়া। তিনি পরলোক গমন করেন ১৯২১ সালের ১৫ ই ফেব্রুয়ারী। তাঁর এক কন্যা এবং দুই পুত্র। কন্যাসন্তানের নাম প্রমোদাসুন্দরী(এঁর নামে গঙ্গা তীরে ঘাট আছে) এবং পুত্রদ্বয়ের নাম দেবেন্দ্রলাল খান ও বিজয়কৃষ্ণ খান।

জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রলাল খান ছিলেন মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের অন্যতম সহযোগী। তিনি ছিলেন বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচিত সদস্য ও ভারতীয় কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী। তিনি মারা যান ৭ ই ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সালে। দেবেন্দ্রলাল খানের একমাত্র পুত্র অমরেন্দ্রলাল খান (১৯১৫ – ১৯৬৪ সাল)। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতি অঞ্জলি খান ছিলেন বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্যা (১৯৫৮ সাল)। এঁদের একমাত্র কন্যা ছিলেন রাজ্যশ্রী ঘোষ।খান পরিবারের এঁরা ৭, দেবেন্দ্রলাল খান রোড, ভবানীপুর বাসভবনে দৌহিত্র সন্তান রাজদীপকে নিয়ে বসবাস করেন। রাজা নরেন্দ্রলাল খানের কনিষ্ঠ পুত্র বিজয়কৃষ্ণের (স্বল্পায়ু) একমাত্র পুত্র ছিলেন অমিয়কৃষ্ণ খান। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের কৃতী আইনজীবি, বসবাস করেন ৭২, রাসবিহারী এভেনিউ বাসভবনে। কন্যা মহুয়া বিশ্বাস ও শ্রাবণী পাল।[১৬]

[১৬] দত্ত, বিমলচন্দ্র, বাংলার খেতাবী রাজ-রাজড়া, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ইন্সটিটিউট অফ রিসার্চ অ্যান্ড কালচার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, স্বাধীনতা দিবস(৪৬ তম), ১৫ ই আগস্ট, ১৯৯২ পৃঃ ১১০-১১১

প্রকৃতপক্ষে যে সময়ে রাজা নরেন্দ্রলাল খান জন্মেছিলেন, সেই সময়টি নাড়াজোল রাজবংশের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। আবার এই সময়ই বাংলার রাজনীতির আকাশে যে অস্থিরতার সঞ্চার হয়েছিল তারই ফলে স্বাধীনচেতা কোন রাজপুরুষেই নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে থাকতে পারেননি। তবে রাজা নরেন্দ্রলাল খানের রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি সমাজসেবা ও মেদিনীপুরের সংস্কৃতি জগতে তাঁর অবদানের কথা তুলে না ধরলে তাঁর চরিত্রের সঠিক মূল্যায়ণ করা হয় না।

নরেন্দ্রলাল খানঃ রাজনৈতিক জীবন

মেদিনীপুরের ইতিহাস বৈপ্লবিক সংস্কৃতির ইতিহাস। অত্যাচারী ও শোষক গোষ্ঠী ইংরেজদের বিরুদ্ধে সারা ভারতব্যাপী যে বিপুল গণজাগরণের উত্থান হয়েছিল, তার তরঙ্গ এসে পড়েছিল মেদিনীপুরের মত একটি প্রত্যন্ত জেলায়। আবার নাড়াজোল মেদিনীপুর জেলার একটি প্রত্যন্ততম গ্রাম। বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনে যে সমস্ত জমিদার বংশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে নাড়াজোলের খান পরিবারের নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের সময় নাড়াজোল জমিদার পরিবার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। নাড়াজোল জমিদার বংশ বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই ছিলেন সরব এবং বিভিন্নভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্য করে থাকেন।

নাড়াজোলে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয় ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ ই এপ্রিল। ইংরেজ সরকার মেদিনীপুরের শাসনভার গ্রহণ করার পরে নাড়াজোল জমিদারীর রাজস্ব প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেন। ইংরেজ সরকারের এই বর্ধিত রাজস্ব দিতে অস্বীকার করেন তৎকালীন জমিদার সীতারাম খান। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ সরকার নাড়াজোলের জমিদারীকে খাস হিসাবে ঘোষনা করেন। ফলে সীতারাম খান ইংরেজ সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।[১] একই সঙ্গে নাড়াজোল জমিদার বাড়ির আত্মীয় কর্ণগড় জমিদারীও খাস ঘোষনা করা হয়। এর পরে মেদিনীপুরের দুই উল্লেখযোগ্য জমিদারবংশ ব্রিটিশ সরকারের রাজস্ব নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। যার ফলশ্রুতি হল ১৭৮৮ সালের চুয়াড় বিদ্রোহ। ইংরেজ

[১] Khan,Rajah Mohendro Lall, Ibid, pp. 5

সরকার কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণি ও নাড়াজোল রাজবাড়ির চুনিলাল খানকে বন্দি করে মেদিনীপুর আবাসগড় দুর্গে বন্দি করে রাখেন।পরে তাঁদের কলকাতায় পাঠানো হয়। সীতারাম খানের মৃত্যুর পরে আনন্দলাল খান নাড়াজোলের জমিদারী উদ্ধার করে পিতৃব্য চুনিলাল খান ও রাণী শিরোমণিকে ইংরেজ সরকারের হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন।[২]

সমগ্র বাংলায় ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে মেদিনীপুর জেলার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। সেই মেদিনীপুরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম সোচ্চার হয়েছিলেন নাড়াজোল ও কর্ণগড়ের জমিদারবর্গ। ১৭৯৯-১৮০০ সালের চুয়াড় বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন কর্ণগড়ের রানী শিরোমণি।[৩] তাঁর রাজপ্রাসাদ কর্ণগড়ের রাজারগড় ও 'আবাসগড়' বিদ্রোহীদের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হয়। একই সঙ্গে এই সময়ে ব্রিটিশ সরকার বাংলায় রাজস্ব সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন দশসালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে। এই নতুন রাজস্ব ব্যবস্থায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তাগণ অত্যন্ত উচ্চহারে রাজস্ব নির্ধারণ করেন। ফলে অনেক পুরোনো জমিদারকে তাঁদের জমিদারী থেকে বিচ্যুত করা হয়। বস্তুত উক্ত সময়ে উচ্চহারে রাজস্ব আদায়, কোম্পানীর আগ্রাসন এবং জমিদারী অধিগ্রহণ সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কর্ণগড়ের রানী শিরোমণি কোম্পানীর দশসালা বন্দোবস্তে বর্ধিতহারে জমিদারীর খাজনা দিতে অস্বীকার করেন। ফলে তাঁর জমিদারী 'খাস' হয়ে যায় অর্থাৎ সরাসরি সরকারী পরিচালনাধীনে চলে যায় (১৭৮৭-১৮০০ সাল পর্যন্ত)।এরপর জমিদারীচ্যুতা রানী শিরোমণি তাঁর 'পাইকান' জায়গির হারানো পাইক তথা পদাতিক সৈনিকদের ও বাগদী, ভূমিজ প্রভৃতি জঙ্গলমহলের ছোট চাষীদের বিক্ষোভের সঙ্গে সামিল হয়ে এক ব্যাপক গণবিক্ষোভের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকার রানীকে এবং তাঁর

[২] ভট্টাচার্য দেবাশিষ, প্রাঃ উক্ত, পৃঃ ১৭২

[৩] রায়, অনিরুদ্ধ, Adventurers and owners and rebels, New Delhi, 1998, pp- 124

তৎকালীন প্রধান কর্মচারীদের কারারুদ্ধ করেন ১৭৯৯ সাল নাগাদ। রানীর প্রধান কর্মচারীদের মধ্যে চুনিলাল খান ছিলেন উল্লেখযোগ্য।[৪] কিছুদিন কারাবাসের পরে রানী মুক্তিলাভ করেন। এই 'চুয়াড় বা পাইক বিদ্রোহ' জঙ্গলমহলে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের 'অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম গণবিদ্রোহ'।[৫]

মেদিনীপুরের নাড়াজোলে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলেও দেখা যায়, ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত নাড়াজোলের জমিদারেরা প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হন নি। কারণ, তাঁরা সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলেন এতবড় জমিদারী পরিচালনার জন্য ইংরেজদের সাহায্য প্রয়োজন। সেকারণে তাঁরা ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। এমনকি পরবর্তিকালে দেখা যায়, এই জমিদার পরিবারের অযোধ্যারাম খান ও মহেন্দ্রলাল খানের সঙ্গে ইংরেজদের যথেষ্ট হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তাঁরা ইংরেজ সরকারের দেওয়া উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

অযোধ্যারাম খান যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সময়টি ছিল নাড়াজোল রাজবংশের ইতিহাসে এক গভীর সংকটের যুগ। জ্ঞাতিভ্রাতাদের সঙ্গে বিরোধের কারণে সম্পত্তির অধিকারের প্রশ্নে তাঁর অনেক ক্ষতি হয়। যাই হোক, আদালতে মামলা-মোকদ্দমার সূত্রে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। তিনি তৎকালীন ভারত সরকারের একজন একনিষ্ঠ প্রজা ছিলেন। মেদিনীপুরের ইংরেজ প্রশাসক এবং কর্মচারীগণও তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। দান-ধ্যান ও সেবাকর্মের মাধ্যমে তিনি সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য ছিলেন। এই সব

[৪] রায়, প্রণব (সম্পা),মেদিনীপুরঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবরণ,৪ র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৯

[৫] ত্বদেব, পৃঃ ৩০

কারণে ১৮৭৭ সালে ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে মহারানির "Empress of India" বা ভারতসম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ উপলক্ষ্যে তিনি একটি সম্মানসূচক পত্র পান।[৬] তাঁর মৃত্যুর পরে রাজা মহেন্দ্রলাল খান পৈতৃক জমিদারীর নিয়মানুসারে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসাবে বিবেচিত হন। ১৮৯৭ সালে ৪ ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে মেদিনীপুরের জেলার জজের কাছে তিনি "মেদিনীপুর রাজ" গ্রহণের সার্টিফিকেট লাভ করেন।[৭]

তাঁদের উত্তরপুরুষ রাজা নরেন্দ্রলাল খান স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনিও তাঁর পূর্বপুরুষদের মতো ইংরেজদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন ঠিকই, কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তিনি বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছিলেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সারা বাংলার বিভিন্ন স্থানে যে সব দোকান তৈরী হয়েছিল, সেগুলিতে অচলাবস্থা দেখা দেয়। আবার অন্যদিকে স্বদেশী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা 'ছাত্র ভাণ্ডার' অর্থের অভাবে বন্ধ হবার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। সেই সময় ক্ষুদিরাম বসুকে রাজা নরেন্দ্রলাল খান ডেকে পাঠান। ক্ষুদিরামের বাবা ত্রৈলোক্যনাথ বসু নাড়াজোল রাজ এস্টেটের তহশিলদার ছিলেন। রাজ এস্টেটের কিছু টাকার হিসাব না পাওয়ায় ত্রৈলোক্যনাথের জমি জায়গা নিলামে ওঠে এবং সেই নিলামের টাকা রাজ এস্টেটের চুরি যাওয়া টাকার ক্ষতিপূরণ হিসাবে নিয়ে নেওয়া হয়। তাই ক্ষুদিরামের অবিভাবক ও ত্রৈলোক্যনাথের জামাতা অমৃতলালকে চিঠি লিখে ক্ষুদিরামকে দেখা করতে বলেন। তিনি ক্ষুদিরামকে পৈতৃক সম্পত্তির সমপরিমাণ জমি ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ক্ষুদিরাম তা নিতে অস্বীকার করেন। ক্ষুদিরাম রাজা নরেন্দ্রলাল

[৬] চৌধুরী,কমল (সম্পাঃ),মেদিনীপুরের ইতিহাস,প্রথম পর্ব, দে'জ পাবলিশিং,জানুয়ারী,২০০৮, পৃঃ ৬১০
[৭] ত্বদেব, পৃঃ ৬১১

খানকে ব্যায়াম সমিতি ও স্বদেশী ভাণ্ডারের জন্য কিছু অর্থ প্রার্থনা করেন। নরেন্দ্রলাল খান জ্ঞানেন্দ্রলাল বসুর হাতে স্বদেশী ভাণ্ডারের জন্য ৫০০০ টাকা পাঠান।[৮]

বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্যে সমগ্র বাংলা জুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন চলতে থাকে। তারই ঢেউ এসে পৌঁছয় নাড়াজোলেও। ১৭ ই অক্টোবর ১৯০৫ সালে নাড়াজোল বাজারের সমস্ত দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন রাজা নরেন্দ্রলাল খান। ম্যানেজার কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নাড়াজোলের মানুষ কংসাবতী নদীতে স্নান করে খালি পায়ে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে গ্রাম পরিক্রমা করেন। ২১ শে অক্টোবর মেদিনীপুরে স্বদেশী সমিতির উদ্যোগে একটি শোভাযাত্রা শহরের পাহাড়ীপুর থেকে শুরু করে সমস্ত শহর পরিক্রমা করে নাড়াজোল রাজের মেদিনীপুরের প্রাসাদে শেষ হয়। সমিতির সমস্ত সদস্যদের রাজা নরেন্দ্রলাল খান ও কুমার দেবেন্দ্রলাল রাখি পরিয়ে দেন এবং সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের গোলাপ স্তবক দিয়ে স্বাগত জানান এবং মিষ্টিমুখ করান। সেদিন মেদিনীপুরের রাজভবন যথার্থই 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে গিয়েছিল।[৯]

২১ শে জুলাই ১৯০৬ সালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘাটাল শহরে বক্তৃতা দিতে আসেন। সেই সভায় কৃষ্ণকুমার মিত্র, মৌলবী মনিরুজুমান, বিহারীলাল সিংহ, রাজা নরেন্দ্রলাল খান প্রমুখ বক্তাদের উপস্থিতি এক অনন্য মাত্রা যোগ করেছিল। ২২শে জুলাই রাজা নরেন্দ্রলাল খান, কুমার দেবেন্দ্রলাল খান, ত্রৈলোক্যনাথ রায় প্রমুখ নাড়াজোলের বাজারে প্রকাশ্যে কেবলমাত্র দেশী সামগ্রী বিক্রির জন্য ব্যাপক প্রচার করেন। রাজা নরেন্দ্রলাল খান পুরোহিত ও পণ্ডিতদের

[৮] ভট্টাচার্য, নাড়াজোলঃ এক অনন্য জনপদ,পৃঃ ২০৭

[৯] প্রাঃ উক্ত, পৃঃ ২০৮

নির্দেশ দেন যে, যারা বিদেশী চিনি ও লবণ ব্যবহার করবে, তাঁদের পৌরোহিত্য যেন তাঁরা না করেন।[১০] মেদিনীপুর বোমা মামলা চলাকালীন সময়ে মেদিনীপুর শহরের তিন ব্যবসায়ী গঙ্গানারায়ণ দত্ত, অখিল চাপড়ি ও রাম চরণ কর আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে নাড়াজোলের রাজা তাঁদের বাধ্য করেছিলেন বিদেশী দ্রব্য আমদানী বন্ধ করতে।[১১]

বস্তুত ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পরে মেদিনীপুর জেলার সমস্ত মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ৭ ই আগস্ট বেলীহলে (বর্তমানে ঋষি রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার) সমবেত ছাত্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূচনা হয়।[১২] কুখ্যাত জেলাশাসক কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য বিহারের মজফ্‌রপুরে বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স দলের দুই সদস্য ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী চেষ্টা করেন। যদিও তাঁদের প্রচেষ্টা সফল হয় নি, তবুও বলা যায় বৈপ্লবিক ইতিহাসে তাঁদের আত্মবলিদান এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৮ সালের ২ রা মে ব্রিটিশ পুলিশ কলকাতার মুরারিপুকুর বাগানবাড়িতে হানা দিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনের কিছু মূল্যবান তথ্যপ্রমাণ পায়। পুলিশ বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ অনেক বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হয় আলিপুর বোমার মামলা। মেদিনীপুরের তৎকালীন পুলিশ কমিশনার মিঃ কার্নিস সি আই ডির কাছ থেকে একটি বিশেষ বার্তা পান।[১৩] ফলে কলকাতার সাথে সাথে মেদিনীপুরেও তল্লাসি অভিযান শুরু হয় তার পরের দিনই। ঐ দিন জেলার ১৩ টি স্থানে তল্লাসি করে ১৫৪ জনের

[১০] চট্টোপাধ্যায়, গৌরীপদ, The Forerunner of India's Freedom Struggle, দিল্লী,১৯৮৬, পৃঃ ৩৩২

[১১] State Archives, Intelligence Branch, Govt of West Bengal, Secret Folder/1908, Subject: Midnapore Conspiracy Case

[১২] দাস বসন্ত কুমার, স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর, প্রথম খণ্ড, প্রকাশক মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস সমিতি, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৮৩,মেদিনীপুর, পৃঃ ৯১

[১৩] State Archives, Intelligence Branch, Govt of West Bengal, 1036/1913, Subject : Printed Note on the Midnapore Revolutionary Conspiracy on record in this file

বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়, যার মধ্যে ২৮ জন ছিলেন জমিদার।[১৪] মেদিনীপুর শহর থেকে পিয়ারীলাল ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রলাল বসু, যোগজীবন ঘোষ প্রমুখদের গ্রেপ্তার করা হয়। [১৫]

এরপর ২৮ শে অগাস্ট পুলিশ মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে তল্লাসি চালায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নরেন্দ্রলাল খানের মেদিনীপুরের গোপ প্রাসাদ, নাড়াজোলের রাজপ্রাসাদ, নাড়াজোলের কাছারিবাড়ি এবং নাড়াজোলের হাওয়ামহল। তল্লাসি চালিয়ে ব্রিটিশ পুলিশবাহিনী নাড়াজোল রাজপ্রাসাদ থেকে কিছু টোটা, বারুদ ও বন্দুক উদ্ধার করেন। ইংরেজ পুলিশবাহিনী রাজা নরেন্দ্রলাল খানকে গ্রেপ্তার করেন। ২ রা সেপ্টেম্বর রাজার মুক্তির আবেদন জন্য আবেদন জানান রানি মৃণালিনী দেবী। তিনি লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে একটি চিঠি লেখেন যেখানে তিনি তাঁর স্বামীকে মুক্তির জন্য আবেদন জানান। যেখানে তিনি লেখেন, "My husband Raja Narendra Lal Khan of Midnapore arrested on 29th August. Although no evidence up to now recorded of Commision of offence by him, and on house searches nothing incriminating was found. Those confessions have been returned and petitions filed by confessions before. Joint Magistrate on 21st August stating those confessions not voluntary but obtained under compulsion. Raja detain in hajat. Food from home disallowed. Application for bail. I with Kumars appeal to your Homour's mercy, and humbly crave kind intervention for release on bail, and Raja undertakes not to leave palace pending trial."[১৬]

[১৪] বসু অতুলচন্দ্র, মেদিনীপুর বোমা-পিস্তল, প্রকাশক এ মুখার্জী এন্ড কোম্পানী, প্রথম প্রকাশ, বাংলা ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ , কলিকাতা, পৃঃ ৭৯-৮১

[১৫] State Archives, Intelligence Branch, Govt. of Bengal, Secret folder/1908, Ibid

[১৬] State Archives, Intelligence Branch, Govt. of Bengal, File No. 51 of 1909, Serial No. 11, also mentioned in an article, নায়ক, মঙ্গল কুমার , "গোয়েন্দা নথিতে ১৯০৮ সালের মেদিনীপুর বোমা মামলায় নাড়াজোল রাজ", ইতিকথা, বর্ষ ১, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৩, পৃঃ ১২৭

৪ ঠা সেপ্টেম্বর রাজা নরেন্দ্রলাল খানকে জামিনে মুক্ত করার জন্য আবেদন জানানো হয়। আদালত সেই আবেদন নাকচ করে দেন। ৭ ই সেপ্টেম্বর প্রায় সাত হাজার সাধারণ মানুষের এক বিশাল সমাবেশ আদালত প্রাঙ্গণে সমবেত হন রাজা নরেন্দ্রলাল খানের মুক্তির দাবিতে। ওই তারিখে সরকার পক্ষ থেকে কোতয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা শুরু হয়। মামলায় সাতাশ জনের নামে অভিযোগ করা হয়, যাঁদের মধ্যে নরেন্দ্রলাল খানের নাম ছিল সবার উপরে। উক্ত সাতাশ জনের অধিকাংশই ছিলেন মেদিনীপুর শহরের অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ।

রাজা নরেন্দ্রলাল খানকে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলের কনডেমড সেলে বন্দি রাখা হয়। পুলিশ আইনজীবীদের এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে না দাঁড়ানোর জন্য আবেদন জানান। তবুও কে বি দত্ত, এ চৌধুরী, এইচ মল্লিক, প্যারীলাল ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন আইনজীবি আসামীদের পক্ষে সওয়াল লরেন। ১০ ই সেপ্টেম্বর আসামীদের জামিনের আবেদন পুনরায় নামঞ্জুর করা হয়। এই আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল জানানো হয়। ইতিমধ্যে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সি এইচ রিডের তত্ত্বাবধানে মেদিনীপুর বোমা মামলার বিচার শুরু হয়েছে। ঐ দিন প্রায় ৭০০০ জনতার এক বিশাল সমাবেশ রাজা নরেন্দ্রলাল খান সহ অন্যান্যদের মুক্তির দাবীতে আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়।[১৭] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজা নরেন্দ্রলাল খানের গ্রেপ্তারের পর থেকে বিভিন্ন সংবাদপত্রে, বিশেষত শিশির কুমার ঘোষের ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’য় নিয়মিতভাবে ‘মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা’ নামে খবর প্রকাশিত হতে থাকে।

[১৭] Amrita Bazar Patrika, September 10, 1908

নাড়াজোলের রাজাকে মেদিনীপুর বোমা মামলার বিচারের সময় কোর্টে হাজির করা হলে, তিনি আদালতের সামনে স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি জমিদার সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি হেমচন্দ্র দাস কানুনগোকে চিনতেন এবং তাঁর প্যারিস যাবার ব্যাপারে রাজা নরেন্দ্রলাল খানের সাহায্য বর্তমান ছিল। মেদিনীপুর মামলায় সাক্ষ্যপ্রদানের সময় রামচরণ সেন, অক্ষয়কুমার পাল সহ কয়েকজন বলেছিলেন যে, হেমচন্দ্র দাসকে প্যারিস পাঠানোর ব্যাপারে যে ২০০ টাকা চাঁদা উঠেছিল, তার মধ্যে ৫০ টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন রাজা নরেন্দ্রলাল খান।[১৮] রাজদ্রোহমূলক কাজের সঙ্গে সঙ্গে এই সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, তিনি তাঁর জমিদারীর পত্তনিদারদের কাছ থেকে তাদের বার্ষিক খাজনার অতিরিক্ত খাজনা আদায় আদায় করেছেন। এই অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের কারণ ছিল, মেদিনীপুর বোমা মামলার খরচ সংগ্রহ করা।[১৯]

মেদিনীপুর বোমা মামলা নিয়ে প্রাপ্ত সরকারী নথি থেকে জানা যায় যে, প্রথম পর্বের সরকারী শুনানিতে সরকারী সাক্ষীরা পুলিশের কাছে যে বয়ান দিয়েছিলেন পরে আদালতে তাঁদের বক্তব্য থেকে সরে আসেন। ফলে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অনেকক্ষেত্রেই সরকারী তথ্যপ্রমাণ ও সাক্ষীদের বক্তব্য দুইয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। যার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই এই মামলা থেকে রেহাই পেয়ে যান। যাঁদের মধ্যে রাজা নরেন্দ্রলাল খান ছিলেন উল্লেখযোগ্য। বস্তুত, এই ঘটনার সঙ্গে রাজা সরাসরি যুক্ত ছিলেন তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

[১৮] State Archives, Intelligence Branch, Secret folder/1908

[১৯] States Archives, Intelligence Branch Report, Govt. of West Bengal, Para 2432 of 1909, p. 5

১৯০৮ সালের আগস্ট মাসে নাড়াজোল রাজার বাড়ি তল্লাসি করার সময়ে অনেককিছু নথিপত্র পাওয়া যায়, যেখান থেকে নাড়াজোল রাজের বিরুদ্ধে অনেক তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। বাজেয়াপ্ত করা তথ্যের তালিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ

১. সন্ধ্যা পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে দান হিসাবে টাকা দিয়েছিলেন (পত্রিকায় সরকার বিরোধী বক্তব্য লেখার জন্য মামলা চলাকালীন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যু)

২. মীরবাজার অনুশীলন সমিতি, বসন্ত মালতি আখড়া এবং মেদিনীপুরের জমিদার সমিতিতে চাঁদা দিতেন।

৩. বিপ্লবী সত্যেন্দ্র বসুর ভাই আমেরিকা প্রবাসী সুবোধ বসুকে সাহায্য করতেন।

৪. 'বর্তমান রণনীতি' নামে একটি রাজদ্রোহমূলক বই কিনেছিলেন, যে বই আলিপুর বোমা মামলায় পাওয়া গিয়েছিল।

৫. শুধাংশুবালা সরকার নামে একজন মহিলা মুজফ্‌রপুরে ক্ষুদিরাম বসুকে দেখতে গিয়েছিলেন, যাকে নাড়াজোল রাজের সহ পরিচালক (Sub Manager) আশুতোষ রায় কলকাতা থেকে নাড়াজোল নিয়ে এসেছিলেন। এবং শুধাংশুবালা সরকারের সঙ্গে রাজার যথেষ্ট হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। যদিও তিনি কি কারণে মুজফ্‌রপুরে গিয়েছিলেন সে বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

৬. ১৯০৬-১৯০৭ সালে দেবদাস করণের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মেদিনীবান্ধব' পত্রিকাটি নিয়মিতভাবে প্রকাশনার জন্য অর্থ সাহায্য করতেন।[২০]

[২০] State Archives, Intelligence Branch, Govt. of West Bengal, Secret File/1908, Ibid

১৯ শে সেপ্টেম্বর পুনরায় হাইকোর্টে তাঁর জামিনের আবেদন করা হয়। আদালতে সেইদিন মধুসূদন দত্ত, শ্যামল সাহা, সারদা দত্ত, বরোদা দত্ত ও নিকুঞ্জ মাইতি ছাড়া আর সবার জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করা হয়। ২৩ শে সেপ্টেম্বর ৫০,০০০ টাকা করে দুই জন জামিনদারের জামিনে রাজা নরেন্দ্রলাল খানের জামিন মঞ্জুর হয়। আদালত নির্দেশ দেন নরেন্দ্রলালকে ব্যক্তিগত ব্যয়ে তাঁর প্রাসাদে পুলিশ প্রহরা বসিয়ে বসবাস করতে হবে। শুধুমাত্র নিকট আত্মীয় ও নিজস্ব কর্মচারী ছাড়া তিনি আর অন্য কারও সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন না। আদালতের নির্দেশে প্রধান ফটকে দুজন করে সশস্ত্র পুলিশ নিযুক্ত হন। রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয় রানী মৃণালিনী দেবী, কুমার দেবেন্দ্রলাল, কুমার বিজয়কৃষ্ণ ও জামাই সুরেশচন্দ্র নিয়োগীকে। আদালতের নির্দেশে দুজন পাংখ্যাপুলার ও একজন পাচক রাজার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পান।[২১] ১৯০৮ সালের ৯ ই নভেম্বর নরেন্দ্রলাল খান সহ চব্বিশ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। বিচার হয় তিন জনের।

মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু তথ্য উঠে এসেছিল, যেগুলি রাজার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। মেদিনীপুরে 'জমিদার সমিতি' নামে একটি সমিতি স্থাপন করা হয়েছিল। এই সমিতিতে সভাপতি ছিলেন রাজা নরেন্দ্রলাল খান। নাড়াজোলের রাজার পরে এই সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন কালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র। তাঁর কাকা ছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী ও আলিপুর বোমা মামলায় প্রধান অভিযুক্ত হেমচন্দ্র দাস। প্রকৃতপক্ষে, রাজা নরেন্দ্রলাল খান বিভিন্ন মিটিং-মিছিলে অংশগ্রহণ করতেন, যেখানে বিভিন্ন দেশাত্মবোধক কর্মসূচী পরিচালিত ও গৃহিত হত।

[২১] State Archives, Home Dept., Govt Of West Bengal, File No. 126 of 1912, Memorandum in the case of Raja N.L.Khan, Raja of Narajole

এই ঘটনার পরে ইংরেজ সরকার নরেন্দ্রলাল খানের প্রতি কড়া নজরদারি শুরু করেন। সরকার তাঁদের দরবার তালিকা থেকে নরেন্দ্রলালকে অপসারিত করেন এবং তাঁর রাজা উপাধি কেড়ে নেওয়া হয়। তিনি তাঁর জমিদারীর খাজনা আদায়ের জন্য পিতামহের সময় থেকে যে সেনাবাহিনীর সাহায্য পেতেন সেই সুবিধাও নষ্ট হয়। আগস্ট, ১৯১১ সালে সরকারের পক্ষ থেকে এক আদেশ জারি করা হয়, যেখানে রাজার সশস্ত্র অনুচর রাখার অধিকার নাকচ করা হয়। এছাড়া তাঁর নিজস্ব যে ১১ টি কামান ছিল তা জেলাশাসকের অধীনে নিয়ে আসা হয়।[২২] যদিও এই কামানগুলির মধ্যে মাত্র ২ টি কামান ব্যবহারযোগ্য ছিল।[২৩]

তবুও নরেন্দ্রলাল খান স্বদেশী আন্দোলন থেকে সরে আসেন নি, দেশপ্রেমিকদের সাথে রাজা নরেন্দ্রলাল অটুট সম্পর্ক রেখেছিলেন। মেদিনীপুরের যুব শক্তিকে জাগ্রত করতে নরেন্দ্রলাল খান প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। ১৯১১ সালে নরেন্দ্রলাল খান আবার সরকার বিরোধী কাজকর্মের জন্য অভিযুক্ত হন। রাজা নরেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে পুনরায় গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করে ইংরেজ সরকার। ২৭ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১১ সালে নরেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন নরেন্দ্রলালের তিন প্রজা পিতাম্বর রায়, অক্ষয় কুমার পাল ও সুজিবুদ্দিন। তাঁরা অভিযোগ করেন নরেন্দ্রলাল খান ও তাঁর গোমস্তা গোপাল রায় তাঁদের জোর করে স্বদেশী ভাণ্ডারে চাঁদা দিতে বাধ্য করেছে।এমনকি চাঁদা না দিলে তাঁদের প্রাণে মেরে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে।[২৪] বলা যেতে পারে, উক্ত মামলার পরে সাধারন মানুষের সঙ্গে রাজার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। রাজা ও

[২২] State Archives, Home Dept., Govt of West Bengal, Secret folder/1909

[২৩] Amrita Bazar Patrika, 11th April, 1911

[২৪] Amrita Bazar Patrika, 13th April, 1911

প্রজাদের মধ্যে এক অসহিষ্ণুতার পরিবেশ তৈরী হয়। ইংরেজ সরকার তাঁর গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখে। ইংরেজ সরকারের সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা থেকে নরেন্দ্রলাল খান বঞ্চিত হন।

১৯১২- ১৯১৩ সালে মেদিনীপুর শহরে 'জর্জ লাইব্রেরী' নামে একটি বই দোকান খোলা হয়। এই বই দোকান সংলগ্ন পোড়াবাড়িতে প্রচুর দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র মজুত রাখা হয়েছিল। নাড়াজোল বাড়িতে তৈরী হত প্রচুর অস্ত্র। রাজবাড়ির উত্তর অংশে ঝিলের ধারে একটি গোপন কক্ষে তৈরী হত দেশীয় অস্ত্র। এখান থেকে জেলার বিভিন্ন অংশে পাঠানো হত এই সব অস্ত্রশস্ত্র। ১৯১৩ সালে কেশপুরে গরুর গাড়িতে প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। গাড়ির চালকসহ আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১০ ই জুন গাড়ির চালককে কোর্টে তোলা হয়। গাড়ির চালক স্বীকার করেন যে, রাজা নরেন্দ্রলাল খান নাড়াজোল থেকে মেদিনীপুরে অস্ত্রগুলি পাঠিয়ে ছিলেন নকুলেশ্বর ভট্টাচার্যের কাছে। রাজা বকশিস বাবদ তাঁকে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছেন। ১২ ই জুন নাড়াজোল রাজবাড়িতে পুলিশ বাহিনী হানা দেয়। কিন্তু পুলিশ বাহিনী উপযুক্ত প্রমাণ পেতে ব্যর্থ হয়।[২৫]

১৯২১ সালের ১৭ ই নভেম্বর যুবরাজ পঞ্চম জর্জের ভারত আগমনের দিন ঘোষণা করা হয়। ২৪ শে ডিসেম্বর যুবরাজের কলকাতায় আসার কথা ছিল। ঐ দিন মেদিনীপুর সহ সমস্ত অঞ্চলে হরতাল পালিত হয়। নাড়াজোল পুরাতন বাজারে সমস্ত দোকান বন্ধ হয় কংগ্রেস কর্মীদের নির্দেশে। নরেন্দ্রলালের ধারাবাহিক ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ সরকারকে বিব্রত করে তুলেছিল। সরকারী গোয়েন্দা বিভাগও সজাগ দৃষ্টি রেখেছিল নরেন্দ্রলাল খানের প্রতি। ১৯০৮ সালের ১০ ই অক্টোবর গোয়েন্দা বিভাগ সরকারকে রিপোর্টে জানায় – "The Raja of Narajole took

[২৫] State Archives, Intelligence Branch, Govt. of Bengal, File No. 699/1908, Subject : Note on the Revolutionary Conspiracy

repressive measures against his tenants who indulged in bilati goods".[২৬] নরেন্দ্রলালের প্রতি ইংরেজ সরকারের তীব্র ক্রোধের অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথমত, ইংরেজ সরকার নরেন্দ্রলাল খানকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করেছিলেন। কিন্তু সেই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্য করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, মেদিনীপুরের স্বদেশী আন্দোলনে রাজার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। তৃতীয়ত, অ্যাডভোকেট জেনারেলের বিরুদ্ধে নরেন্দ্রলালের মামলা। চতুর্থত, ব্রিটিশ প্রশাসনকে মেদিনীপুর টাউন স্কুল থেকে অপসারিত করা।[২৭]

ইংরেজ সরকারের কাছে খবর ছিল রাজা নরেন্দ্রলালের সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, অরবিন্দ ঘোষ, হেমচন্দ্র কানুনগো, বারিন্দ্রকুমার ঘোষ, ক্ষুদিরাম বসু প্রমুখের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এছাড়াও তাঁরা জানতেন যে নরেন্দ্রলাল খানের আর্থিক সাহায্যের উপর নির্ভর করে স্বতন্ত্র বৈপ্লবিক গুপ্ত সংস্থা তৈরী হয়েছে। এবং মেদিনীপুরের 'বিপ্লবীদের আখড়া', ছাত্রভাণ্ডার, মাতৃসদন, বসন্ত মালতী আখড়া প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালক ছিলেন রাজা নরেন্দ্রলাল। এছাড়াও গোয়েন্দা বিভাগের কাছে খবর ছিল নরেন্দ্রলাল বিপ্লবীদের বোমা তৈরীর জন্য ২০০ টাকা দিয়েছিলেন। তাই নরেন্দ্রলাল খানকে ইংরেজ সরকার মুরারীপুকুর বোমার মামলায় ও মেদিনীপুর বোমা মামলায় জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন ইংরেজ সরকার। এরপর রাজা কারাগার থেকে বেরিয়ে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেন। মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক বিনয়জীবন ঘোষ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, সে যুগের মেদিনীপুরের ব্রিটিশ সরকারের শাসন ধারা, ইংরেজ কর্মচারীদের মনোবৃত্তি এবং ইংরেজ সরকারের কার্যাবলি সবকিছুই ফুটে ওঠে তিনটি মামলার মধ্য দিয়ে – মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা, রাখালচন্দ্র লাহার মামলা এবং প্যারীমোহন দাস,

[২৬] ভট্টাচার্য, নাড়াজোলঃ এক অনন্য জনপদ, পৃঃ ২১৬

[২৭] ভট্টাচার্য, প্রাঃ উক্ত, পৃঃ ২১৯

রাজা নরেন্দ্রলাল খান প্রমুখের দ্বারা আনীত ভারত সচিবের (সেক্রেটারী অফ স্টেট) বিরুদ্ধে মানহানি জনিত ক্ষতিপূরণ দাবীর মামলা।[২৮]

ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে নরেন্দ্রলাল খান চরম আঘাত হেনেছিলেন ১৯১০ সালে। সেই সময় সরকারী প্রয়োজনে মেদিনীপুর টাউন স্কুল ব্রিটিশ পুলিশ কিছুদিন ব্যবহার করেছিল। স্কুলের মধ্যেই পুলিশের ক্যাম্প তৈরী হয়েছিল। কিন্তু অনুমোদিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার পরেও পুলিশ স্কুলটি নিজেদের ব্যবহারে রাখায় রাজা নরেন্দ্রলাল খান তাঁর সশস্ত্র বাহিনী পাঠিয়ে পুলিশ ক্যাম্প সরিয়ে দেন এবং স্কুল ভবন থেকে জেলা শাসক বাধ্য হয়ে পুলিশ ক্যাম্প সরিয়ে নেন।[২৯]

নরেন্দ্রলাল খান মেদিনীপুরের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে তাঁর নিরলস সংগ্রাম তাঁকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক বর্ণময় চরিত্রে পরিণত করেছে। একদিকে প্রজাহিতৈষণামূলক কাজকর্ম এবং অন্যদিকে তাঁর দেশপ্রেম এই দুইয়ের সমন্বয় তাঁকে যথেষ্ট সুখ্যাতি দিয়েছিল। ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে শুধুমাত্র বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে এক আলাদা স্থানের অধিকারী ছিলেন তিনিই। যে সময়ে সমগ্র ভারত জুড়ে দেশীয় রাজন্যবর্গ ও জমিদার শ্রেণী ব্রিটিশদের তোষণ করতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে রাজা নরেন্দ্রলাল খানের আবির্ভাব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এক নতুন বলে বলীয়ান করেছিল। সেই নতুন বল শুধুমাত্র আর্থিক সাহায্যদানই নয়, মানসিক দিক থেকেও তাঁরা সাহায্য পেয়েছিলেন।

[২৮] Chatterjee, Pranab Kumar, Ibid, pp. 68-69

[২৯] ভট্টাচার্য, দেবাশিষ, নাড়াজোলঃ এক অনন্য জনপদ, পৃঃ ২২০

রাজা নরেন্দ্রলাল খানঃ সমাজসেবা ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলি

নাড়াজোল রাজপরিবার শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে মেদিনীপুরের ইতিহাসে বিখ্যাত ছিলেন না। সামাজিক দিক থেকে তাঁদের যে একটা দায়িত্ব বা কর্তব্য ছিল, সে বিষয়ে তাঁরা সর্বদা সচেতন ছিলেন। তৎকালীন ঘাটাল, বিশেষত নাড়াজোল ও জেলা মেদিনীপুরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের জনহিতকর কার্যাবলির বিবরন পাওয়া যায়। শিক্ষা বিস্তার, জনসচেতনামূলক কার্যাবলি, জেলার সাধারণ মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক চেতনা বৃদ্ধি প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যে নাড়াজোলের রাজাদের নাম ছিল সর্বাগ্রগন্য। মেদিনীপুর জেলায় তথা বাংলায় ইংরেজ অধিকারের আগে এই অঞ্চলটির অগ্রগতির ক্ষেত্রে জমিদার শ্রেণীর ভূমিকা উল্লেখ্যযোগ্য।

মেদিনীপুরের মধ্যে এই ঘাটাল অঞ্চলটি ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে অত্যন্ত উল্লেখ্যযোগ্য। সেসময়ে এই অঞ্চলে প্রায় প্রতিটি গ্রামেই 'টোল' বা 'চতুষ্পাঠী' ছিল। স্থানীয় অধ্যাপকবৃন্দ এই সমস্ত টোল পরিচালনা করতেন। নাড়াজোল রাজবাড়িতে দানসাগর শ্রাদ্ধে প্রায়ই অনেক অধ্যাপকের সমাবেশ হত। যদিও এই সমস্ত অধ্যাপকদের অধিকাংশই ছিলেন স্থানীয়। তবে বারাণসী ও দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশ থেকেও অনেকের এই উপলক্ষ্যে নাড়াজোলে আগমন হত।[১]

[১] পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ, ঘাটালের কথা, প্রথম খণ্ড, প্রকাশক সদেশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৭৭ সাল, পৃঃ ১০৩

রাজা মোহনলাল খান 'লঙ্কাগড়ের দীঘি' খনন করান এবং নিকটবর্তী সামাটগ্রামের 'অস্থল' (বৈষ্ণব মঠ) প্রতিষ্ঠা করেন। নাড়াজোলে রামনবমীতে রথযাত্রা ও মেলা, জয়দুর্গার বাৎসরিক পূজা মহোৎসব প্রভৃতি রাজবংশ কর্তৃক প্রচলিত। নাড়াজোলের রাজবাটি 'ভিতরগড়ে'র মধ্যে অবস্থিত এবং মন্দির-দেবালয়, রাসমঞ্চ (পঁচিশ চূড়া), রাজপরিবারের কয়েকজনের সমাধিমন্দির বাহিরগড়ে অবস্থিত। রাজবাটির চারপাশ গভীর ও চওড়া পরিখা বেষ্টিত।[২]

রাজা মহেন্দ্রলাল খান ছিলেন বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ হল 'The History of Midnapore Raj'। গ্রন্থটি ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিতে তিনি তাঁর বংশ ও কর্ণগড়ের রাজবংশের একটি তথ্যনির্ভর ইতিবৃত্ত রচনা করেন। এছাড়া তিনি 'সঙ্গীতলহরী' (১৮৭১ সাল), 'মনমিলন' নামে গীতিনাট্য (১৮৭৮ সাল), 'গোবিন্দগীতিকা' (১৮৮০ সাল), 'শারদোৎসব' (১৮৮১ সাল), 'মথুরামিলন' (১৮৮৩ সাল) প্রভৃতি গ্রন্থগুলি রচনা করেন।[৩] তাঁর এই গ্রন্থগুলি থেকে তাঁর কাব্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা কবিতার প্রতি তাঁর একান্ত অনুরাগ তাঁকে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়নে অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি ছিলেন যথার্থই একজন কবি, সাহিত্যিক ও রসগ্রাহী ব্যক্তি। এই সমস্ত গ্রন্থ বাজারে বিক্রি তিনি করতেন না। রাজার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে এগুলি বিতরিত হত। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি থেকে তাঁর ভগবদ্ভক্তি সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়াও তিনি 'আধ্যাত্ম রামায়ণ' এর পদ্যানুবাদের কিছু অংশ রচনা করেন।[৪]

---

[২] রায় পঞ্চানন ও প্রণব রায়, ত্বদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৯

[৩] ত্বদেব, পৃঃ ৬৯

[৪] হারাণচন্দ্র রক্ষিত রচিত প্রবন্ধ "রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁন", চৌধুরী, কমল (সম্পা.), মেদিনীপুরের ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০৮, প্রকাশক, দে'জ পাবলিশিং

নাড়াজোলের ইতিহাসে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের আগে যে সংস্কৃত শিক্ষা প্রচলিত ছিল, তা বিস্তারের জন্য নাড়াজোল রাজারা ছিলেন সর্বদাই সচেষ্ট। নাড়াজোলের রাজারা প্রতি বছর জন্মাষ্টমীর দিনে একটি ধর্মসভার আয়োজন করতেন। এই ধর্মসভায় সে সময়কার বিশিষ্ট পন্ডিতেরা অংশগ্রহণ করতেন। যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নবদ্বীপের যদুনাথ সার্বভৌম, চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, ময়মনসিংহের হরিনাথ স্মৃতিভূষণ প্রমুখ। এই সব পন্ডিতেরা নাড়াজোলে এসে তাঁদের জ্ঞান সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করেন। ধর্মসভার শেষে রাজা প্রত্যেককে তাঁদের মর্যাদা অনুসারে বিভিন্ন জিনিস দান করতেন।[৫]

বস্তুত, নাড়াজোল রাজটোল ঘাটাল মহকুমার একটি প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র। ১৮৯২ সালে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন লিখিত 'A Report on the Tols of Bengal' এ এই টোলের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে ব্যাকরণ, স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি পড়ানো হত। টোলের দুঃস্থ ছাত্রদের শিক্ষার ব্যয়ভার রাজারা গ্রহণ করেছিলেন, যে কারণে এই টোলটি সে সময়কার শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করেছিল। টোলের অধ্যাপকদের মাসিক বৃত্তি প্রদান করা এবং বিভিন্ন কর্ম উপলক্ষ্যে ভূমিদান করা প্রভৃতির মাধ্যমে নাড়াজোলের রাজারা এই এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

[৫] ভট্টাচার্য, দেবাশিষ, ত্বদেব, পৃঃ ৯৪

১৮৯১ সালে বাংলার তৎকালীন গভর্নর স্যার চার্লস ইলিয়ট বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সংস্কৃত টোলের অবনতির কারণ অনুসন্ধানের জন্য সংস্কৃত কলেজের সেই সময়কার অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নকে নিযুক্ত করেন। আর্থিক সহায়তা দানের মাধ্যমে কিভাবে সংস্কৃত চর্চা পুনরায় বাংলায় জনপ্রিয় করা যাবে, সেই বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য প্রচেষ্টা চালান। রাজা মহেন্দ্রলাল খান, নিমতলার সম্পন্ন জমিদার চন্দ্রনাথ গুঁই প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় ২ রা জুন ১৮৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ঘাটাল-নিমতলা সংস্কৃত সমিতি'। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল এই অঞ্চলে সংস্কৃত শিক্ষার বিকাশ ঘটানো।

ঘাটাল শহরের অদূরবর্তী শিলাই নদীর তীরের এক সময়কার সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র নিমতলার (পূর্ব নাম 'হেমন্তনগর') অবস্থান। এখানে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত সমিতিটি মহকুমা তথা সমগ্র জেলার মধ্যে সরকারের 'Bengal Sanskrit Association' (পরবর্তীকালের 'বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ') এর অনুমোদিত চতুষ্পাঠীগুলির মধ্যে সংস্কৃত আদ্য ও মধ্য পরীক্ষা গ্রহণ করার একটি বিখ্যাত সংস্থা ছিল। এর পৃষ্ঠপোষকরা ছিলেন সেই অঞ্চলের ধনী ব্যক্তিবর্গ।[৬]

এই সংস্কৃত সমিতির পক্ষ থেকে সেই সময়কার সমগ্র মেদিনীপুর জেলা, পার্শ্ববর্তী হুগলী ও বাঁকুড়া জেলার কিছু কিছু টোলের পরীক্ষা নেওয়া এবং সরকার প্রদত্ত বৃত্তি প্রদান করা হয়। রাজা মহেন্দ্রলাল খান ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ। শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের উদ্যোগে এই সমিতিটি সেই সময়কার দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার শিক্ষাজগতের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে আর্থিক সাহায্যদানের মাধ্যমে

[৬] রায়, প্রণব, ঘাটালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৬১

একটি উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন রাজা মহেন্দ্রলাল খান। তিনি নিয়মিতভাবে তাঁর রাজকোষ থেকে প্রতি বছর ৫০০ টাকা প্রদান করতেন।[৭] এইভাবে বংশের শিক্ষানুরাগের ঐতিহ্যের ধারা তিনি বজায় রেখেছিলেন।

রাজা মহেন্দ্রলাল খানের পরে এই ঘাটাল-নিমতলা সংস্কৃত সমিতির প্রধান উদ্যোক্তা হন তাঁরই সুযোগ্য উত্তরাধিকারী রাজা নরেন্দ্রলাল খান। হারাণচন্দ্র রক্ষিত তাঁর প্রবন্ধে রাজা নরেন্দ্রলাল খানের সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং তাঁকে সচ্চরিত্র ও অমায়িক বলে প্রশংসা করেছেন।[৮] বংশের পরম্পরা রক্ষা করে তিনি শিক্ষাবিদ্ ও গুণীজনদের সমাদর ও সম্মান জানাতেন। আলোচ্য সংস্কৃত সমিতিটির পরিচালনা বাবদ বাৎসরিক ৫০০ টাকা প্রদান ছাড়াও অতিরিক্ত বার্ষিক ১০০০ টাকা দিয়ে একটি বৈদিক পরীক্ষার আয়োজন করেন। এই পরীক্ষায় প্রকৃতরূপে হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ে ছাত্রদের দক্ষতার প্রমাণ দিতে হত। 'হলায়ুধ' ও 'গুণবিষ্ণু' নামে দুই পরীক্ষায় যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করতেন, রাজা নরেন্দ্রলাল খান তাঁকে তাঁর মায়ের নামাঙ্কিত স্বর্ণপদক প্রদান করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই সংস্কৃত সমিতিটির স্ত্রীসদস্যগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন রাজা নরেন্দ্রলাল খানের পিতৃব্য শ্রীউপেন্দ্রলাল খানের স্ত্রী শ্রীমতি বিধুমুখীদেবী।[৯]

উক্ত সংস্কৃত সমিতিটির বাৎসরিক বিবরণী থেকে নাড়াজোল রাজাদের এই অঞ্চলে শিক্ষাপ্রসারের জন্য তাঁদের আগ্রহের কথা জানতে পারা যায়। ১৮১৭ শকাব্দ (১৮৯৪ সাল)

[৭] ত্বদেব, পৃঃ ৩৩১-৩৪৬

[৮] চৌধুরী, কমল, ত্বদেব, পৃঃ ৬১৪

[৯] রায়, প্রণব,ত্বদেব, ৪ র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৪৪-৩৪৫

সমিতির মহাপরিচালক পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রী মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ঘাটাল-নিমতলার একটি সভায় রাজা নরেন্দ্রলাল খানকে একটি অভিজ্ঞানপত্র প্রদান করেন। এই অভিজ্ঞানপত্রটি শুধুমাত্র রাজার সপ্রশংস উল্লেখই নয়, তাঁর জনহিতকর কার্যাবলীর এক সুন্দর দলিল বলা যেতে পারে। সমিতিটির ১৮৩৪ (১৯১১ সাল) এবং ১৮৩৬ শকাব্দের (১৯১৩ সাল) বাৎসরিক বিবরণের দুটি পাতা ও সেই অভিজ্ঞানপত্রটি[১০] দেখে এই ধারণাই প্রতীয়মান হয় যে রাজা নরেন্দ্রলাল খান মেদিনীপুরের ইতিহাসে একজন স্বাধীনতাকামী জননেতা হিসেবেই নয়, একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন।

শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে নাড়াজোলের নাম এক অনন্য স্থানের অধিকারী। তৎকালীন সময়ে যেখানে জাতিবৈষম্য ও জাতিভেদ প্রথা প্রধান মাধ্যম ছিল, সেখানে এই অঞ্চলের শিক্ষা জগতের শিক্ষাকেন্দ্রে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই শিক্ষাগ্রহণ করতে পারতেন। ব্রাহ্মণ ছাত্রদের সঙ্গে অব্রাহ্মণ ছাত্ররাও রাজ টোলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন। ১৮৯৫ সালে নাড়াজোলের রাজ টোলের বৃত্তি প্রদানের তালিকায় দুই অব্রাহ্মণ ছাত্রের নাম পাওয়া যায় – ভূতনাথ ভূঞ্যা ও উমাচরণ ঘোষ।[১১] বস্তুত, প্রজাদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা ও শ্রেণীবৈষম্য দূর করতে নাড়াজোলের রাজারা যেভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন তা সত্যই প্রশংসনীয়।

নাড়াজোলের রাজটোল থেকে অসংখ্য বিদ্যার্থী শিক্ষালাভ করে সংস্কৃত শিক্ষায় পারদর্শী হয়েছিলেন। এই টোলটির ব্যয়ভার রাজারাই বহন করতেন। ১৯১৩ সালের সরকার নির্দিষ্ট

[১০] ত্বদেব, পৃঃ ৩৩৪-৩৩৫

[১১] ভট্টাচার্য, দেবাশিষ ,ত্বদেব, পৃঃ ৯৯

পরীক্ষায় যে সমস্ত ছাত্ররা উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং রাজা নরেন্দ্রলাল খান প্রবর্তিত দুইটি পরীক্ষা – ‘হলায়ুধ’ ও ‘গুণবিষ্ণু’তে যে সব ছাত্ররা উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নাম হল –

ব্যাকরণ আদ্যঃ

১. রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য দ্বিতীয় বিভাগ

২. অতুলচন্দ্র প্রচণ্ড ,, ,,

বেদান্ত আদ্যঃ

১. যামিনীকান্ত কাব্যতীর্থ ,, ,,

মধ্য পরীক্ষা

কাব্য-বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী ,, ,,

বেদান্ত-দুর্গাপ্রসাদ কাব্যতীর্থ ,, ,,

নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খান প্রবর্তিত সহস্র মুদ্রা পারিতোষিকের পরীক্ষায় ‘খ’ চিহ্নিত পাঠ্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা হলেন-

১. ভূপতিনাথ দাস দ্বিতীয় বিভাগ

২. লক্ষ্মীনারায়ণ দাশ ,, ,,

৩. হেরম্বনাথ ভট্টাচার্য ,, ,,

সাধারণ মানুষের কাছে সংস্কৃত শিক্ষাকে জনপ্রিয় করতে নাড়াজোলের রাজাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।[১২] তবে ১৯১৩ সালের পরে সম্ভবত এই রাজটোলের জায়গা নেয় রাজ পাঠশালা।

নাড়াজোলের শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে সংস্কৃত সমিতি ও রাজটোল ছাড়াও রাজ পাঠশালা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৮৬০ সালের রাজবাড়ির একটি হিসাবের খাতায় পাঠশালার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পাঠশালায় সংস্কৃত, গণিত, অর্থনীতি ও ভূগোল পড়ানো হত। ১৮৫৮ সালে মহেন্দ্রলাল খান পাঠশালাটিকে স্কুলে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের কাছে তিনি আবেদন জানান, যদিও এই আবেদন মঞ্জুর হয় নি। ১৮৮৭ সালে তিনি 'রাজা' উপাধি পাওয়ার পরে আবার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে উদ্যোগী হন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে তাঁর উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয় নি।[১৩]

১৮৯২ সালে মহেন্দ্রলাল খানের মৃত্যুর পরে তাঁর সুযোগ্য পুত্র নরেন্দ্রলাল খান জমিদারীর দায়িত্ব গ্রহণের পরে তাঁর প্রথম ও প্রধান কাজই ছিল পিতার পরিকল্পিত স্কুল প্রতিষ্ঠা করা। ১৮৯৪ সালে নরেন্দ্রলাল খানের আগ্রহে নাড়াজোল পাঠশালাটি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করে পিতার নামে উৎসর্গ করেন। বিদ্যালয়টির নাম দেন 'নাড়াজোল মহেন্দ্র একাডেমী'। মিডিল ক্লাস স্কুল হিসেবে এটির সূচনা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এটি সরকারী অনুমোদন পায় নি।

[১২] ত্বদেব, পৃঃ ১০০-১০১

[১৩] রায়, প্রণব ত্বদেব, পৃঃ ১০৬-১১০

প্রাথমিকপর্বে এই বিদ্যালয়টিতে ছাত্রসংখ্যা ছিল খুবই সীমিত। সূচনাতে এখানে প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হত। এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য রাজা নরেন্দ্রলাল খানের ভূমিকা অগ্রগণ্য। পঠন-পাঠন, ছাত্রবৃত্তি এবং নিখরচায় ছাত্রদের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শস্য উৎপাদনের কৌশল শেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। বাস্তবজ্ঞানসমন্বিত এই শিক্ষাব্যবস্থাটি তৎকালীন সময়ে এই অঞ্চলে প্রভূত জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ফলে ছাত্র সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১৪] ১৯০৯ সালের একটি পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় যে, এই অঞ্চলটি পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অঞ্চলের বিদ্যালয়ের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় এই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বেশ ভালোই ছিল। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯০৯ সালে মেদিনীপুর অঞ্চলের ১৭ টি বিদ্যালয়ের মধ্যে নাড়াজোলের বিদ্যালয়টিতে ৯৬ জন ছাত্র পড়াশুনা করত।[১৫] যা সেই সময়ের বিচারে যথেষ্ট উন্নত ভাবনার পরিচয় দেয়। এই বিদ্যালয়টিতে প্রাথমিক পর্বে যেসমস্ত প্রধানশিক্ষকেরা তাঁদের শিক্ষাদান, আত্মত্যাগ ও কর্মের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গঙ্গানারায়ণ ঘোষ, অবিলাশ চৌধুরী, রাজেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ।[১৬] নাড়াজোল রাজ লাইব্রেরী যথার্থ ভাবে জনসাধারনের কল্যানের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে। মূলত সাধারণ মানুষের মধ্যে জনশিক্ষার প্রচার করাই ছিল তাঁর এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য।

রাজা নরেন্দ্রলাল খান তার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টিতে যেভাবে বাস্তবসম্মত ও দৈনন্দিনজীবনে প্রয়োগবিদ্যামূলক জ্ঞানদানের ব্যবস্থা করেছিলেন, তারই পাশাপাশি তিনি তাঁর বাগানে উন্নতমানের

[১৪] দাস, বিনোদশঙ্কর ও প্রণব রায়, মেদিনীপুরঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, পৃঃ ২২১

[১৫] O'Malley, L.S.S, Bengal District Gazetteers : Midnapore, Calcutta, The Bengal Secretariat Book Depot, 1911, pp. 160

[১৬] নাড়াজোল মহেন্দ্র একাডেমি শতবর্ষ স্মরণিকা, ১৯৯৪, পৃঃ ৩১

ফল ও সব্জির চাষ করা শুরু করেছিলেন, যেগুলি সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিপালন করা হত। নাড়াজোল উত্তরদিকে শিলাই নদী ও দক্ষিণদিকে পলাশপাই খাল দ্বারা বেষ্টিত রয়েছে। তাই এই অঞ্চলটি কৃষিতে অত্যন্ত উন্নত। কিন্তু কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে কৃষকেরা সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ না করায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এই সমস্যাকে দূর করার জন্য রাজার এই উদ্যোগ সত্যই প্রশংসনীয়।

মেদিনীপুর বোমা মামলা চলাকালীন সময়ে রাজার আইনি কৌঁসুলি মিঃ কিয়াস রাজা নরেন্দ্রলাল খানের জামিনের আবেদন করার সময় তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, "The Raja of Narajole was a man of unmistakable and striking personality, of vast property and enormous wealth. His charities were numerous and he was popular with all classes of people. He had been honored with the title of Raja for his well-known loyalty and benevolent acts."[১৭]

মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার জন্য রাজা নরেন্দ্রলাল খান প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন। সমাজের সর্বনাশা পণপ্রথা বিলোপের চেষ্টা করেছিলেন কলকাতায় 'প্রজাপতি সমিতি' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। নানা জনহিতকর কাজের জন্য ২৯ শে নভেম্বর ১৮৯৫ সালে ইংরেজ সরকার তাঁকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন। সেই সময়কার বাংলার ছোটলাট স্যার চার্লস ইলিয়ট রাজাকে দেওয়া সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, "Raja Narendra Lall Khan,- Your family has been long held and highly respected in the Midnapore District, and been known by the title of Rajah, and it is in recognition of the fact, as well as of your own personal

[১৭] Amrita Bazar Patrika, Calcutta, September 5, 1908

merits, that the title has been bestowed upon you by His Excellency the Viceroy and Government of India. You have distinguished yourself by your liberality in assisting diverse public objects. You have assisted the Dufferin find to which you have given a large subscription. I have reason to believe that you will continue in the manner in which you have begun your life, and may go on doing acts which would confer upon you more distinguished honours, by acting as an honourable and publicized landlord and a leader of your fellowmen in the Midnapore District and in the Province of Bengal."[১৮]

রাজা নরেন্দ্রলাল খান শুধুমাত্র নাড়াজোলের উন্নতিবিধান নয়, মেদিনীপুর ও কলকাতায় বিভিন্ন জনসেবামূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠাতে নরেন্দ্রলাল খানের উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। কলকাতায় একটি কাচের কল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে রাজার উদ্যোগ ছিল। এই কলটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কলকাতার কয়েকজন ধনী ব্যবসায়ী প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। কিন্তু পরে কারখানাটি বন্ধ হয়ে গেলে নরেন্দ্রলাল খান এটি কিনে নেন। এই কারখানাটির মাধ্যমে বাঙালি তরুণেরা বিদেশি কারিগরদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করতেন।[১৯]

মেদিনীপুর সদর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য রাজা নরেন্দ্রলাল খান ৫০ হাজার টাকা সাহায্য করেন। তিনি তাঁর প্রজাদের প্রতি সর্বদা সদয় ছিলেন। তিনি প্রতিদিন ২৫ মণ করে চাল দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে বিতরণ করতেন।[২০] মেদিনীপুরে জলের সুব্যবস্থা করতে রাজা নরেন্দ্রলাল খান উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। শহরে জলের কল স্থাপন করার জন্য তিনি এক লক্ষ টাকা প্রদানে

[১৮] ভট্টাচার্য, দেবাশিষ, ত্বদেব, পৃঃ ১৯২

[১৯] ত্বদেব, পৃঃ ১৯২

[২০] Amrita Bazar Patrika, September 5, 1908

প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, যদিও এই পরিকল্পনা সফল হয় নি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডারে ইনি পাঁচ হাজার টাকা দিতে সম্মত হন।[২১] ১৯২০ সালে মেদিনীপুর শহরে বাংলা প্রাদেশিক কমিটির সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়, যদিও তিনি সভাপতি হতে অস্বীকার করেন।[২২]

নরেন্দ্রলাল খান মেদিনীপুর বোমা মামলায় গ্রেপ্তারের পরে ইংরেজ সরকারের কাছে তাঁর হৃতগৌরব ফিরে পাওয়ার জন্য বাংলার গভর্ণরকে একটি পত্র লেখেন। সেই পত্রে নরেন্দ্রলাল খান তাঁর জনহিতকর বিবরণের একটি তালিকা দেন। সরকারের বিভিন্ন তহবিলে অর্থ সাহায্যের কথা তিনি ঘোষণা করেন।[২৩]

রাজা নরেন্দ্রলাল খানের উত্তরসূরী দেবেন্দ্রলাল খানের সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্কের ভিত দাঁড়িয়েছিল কুমার দেবেন্দ্রলালের গৃহশিক্ষক পন্ডিত শ্রীহরিচরণ বন্দোপাধ্যায়ের মধ্য দিয়ে। বঙ্গীয় শব্দকোষ রচনা করেছিলেন ইনি। বলাই বাহুল্য, তিনি কুমারের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন রাজা নরেন্দ্রলালের সময়েই। তাই বলা যায়, ঠাকুর পরিবারের সঙ্গেও খান পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বহু পূর্ব থেকেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।[২৪]

---

[২১] চৌধুরী, কমল, ত্বদেব, পৃঃ ৬০৮

[২২] ভট্টাচার্য, দেবাশিষ, ত্বদেব, পৃঃ ১৯৩

[২৩] Chatterjee, Pranab Kumar, Midnapur's Tryst with Struggle, The State Archives of West Bengal, 2004, pp. 65

[২৪] চট্টোপাধ্যায়, সুদিন, 'নাড়াজোল রাজপরিবারঃ দেবেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ', নাড়াজোল রাজ কলেজে অনুষ্ঠিত সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, ২ রা মে, ২০০৭ সাল, পৃঃ ১২, নাড়াজোল কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর, আরও উল্লেখিত নায়ক, মঙ্গল কুমারের অপ্রকাশিত গবেষণা পত্রে

১৯০৯ সালে রাজা নরেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হলে ইংরেজ সরকার ভীত হয়ে পড়েন। তাঁদের দরবারের তালিকা থেকে তাঁকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া 'রাজা' উপাধিও কেড়ে নেওয়া হয়। এমনকি নরেন্দ্রলাল খান যে বিশেষ পদাধিকারবলে দশ জন বন্দুকধারী সৈন্য রাখার অধিকার পেয়েছিলেন, তা কেড়ে নেওয়া হয়। যাই হোক, রাজনৈতিক দিক থেকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে যোগদান থেকে সরে আসেন। তবে যে উদ্যম নিয়ে তিনি তাঁর সমাজসেবামূলক ও সাংস্কৃতিক চর্চা করছিলেন, তা থেকে অনেকটাই সরে আসেন।

নরেন্দ্রলাল খান শুধুমাত্র গুণি জনদের পৃষ্ঠপোষকতাই নয়, নিজেও যে একজন সুকবি ও সুলেখক ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে। তাঁর রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল 'পরিবাদিনী শিক্ষা' নামক বইটি। এছাড়াও নরেন্দ্রলাল খান এবং তাঁর সঙ্গীত শিক্ষাগুরু এবং বিষ্ণুপুর ঘরানার অন্যতম প্রধান সঙ্গীতশিল্পী রামপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় তিনটি বই রচনা করেন। সেগুলি হল 'সঙ্গীত মঞ্জরী', 'মৃদঙ্গ দর্পণ' এবং 'এসরাজ তরঙ্গ'। এছাড়া, এই ঘরানার আরেক অন্যতম দিক্‌পাল গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায় নরেন্দ্রলাল খানের আর্থিক সাহায্যে 'সঙ্গীত চন্দ্রিকা' ও 'গীতদর্পণ' প্রকাশিত হয়। এই বইগুলি রাজা নরেন্দ্রলাল খান বিভিন্ন জ্ঞানীগুণি ব্যক্তিদের দিতেন। রাজার মহিষী রানি মৃণালিনী দেবী 'স্তুতিকুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটির ভূমিকা লেখেন রাজটোলের অধ্যাপক শ্রী পঞ্চানন দেববর্মা।[২৫]

[২৫] ভট্টাচার্য, দেবাশিষ, পৃঃ ১৫৭

রাজা নরেন্দ্রলাল খানের মহৎ চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় দান কার্যের সময় তিনি ধর্ম ভেদ দেখতেন না। বাংলার লোকসংস্কৃতির এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পটশিল্প। নাড়াজোলে অনেক আগে থেকেই পটশিল্প ও পটুয়া সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। তাঁর পূর্বপুরুষেরা অনেকসময়েই রাজবাড়িতে কোন উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন। যেখানে পট তৈরী ও মূর্তি তৈরী ছিল এক জনপ্রিয় প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় শুধুমাত্র নাড়াজোল থেকেই নয়, আশেপাশের সব অঞ্চল থেকেই পটশিল্পীরা যোগদান করতেন। ফলে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তাঁরা যেমন একই সাথে রাজসম্মান প্রাপ্ত হতেন, তেমনই অন্যদিকে বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পীদের সঙ্গে শিল্পের ও শিল্পচেতনার আদানপ্রদানের মাধ্যম হয়ে পড়েছিল এই প্রতিযোগিতা। রাজা নরেন্দ্রলাল খানও বংশের এই ধারা বজায় রেখেছিলেন। বিভিন্নভাবে এই শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তাঁর উৎসাহের অভাব ছিল না। গুণী শিল্পীদের তিনি বিভিন্নদিক থেকে সাহায্য প্রদান করতেন।

পটশিল্পীরা সবাই ছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের জন্য তিনি নাড়াজোলে একটি মসজিদ নির্মাণ করে দেন। যা সেই সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৯১২ সালে এই অঞ্চলের বিখ্যাত পটশিল্পী নবলাল পটিদারের পুত্র গোলাপ রোব্বানী পটিদার ও চন্দ্রাবতী বিবিকে তিনি একটি জমির রায়তি বন্দোবস্ত প্রদান করেন।[২৬] এভাবে তিনি যেমন একটি শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে উদ্যোগই গ্রহণ করলেন তাই নয়, একই সঙ্গে সাধারণ মানুষকে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

[২৬] ত্বদেব, পৃঃ ৭১

আঞ্চলিকভাবে জেলার সাংস্কৃতিক কার্যকলাপকে এগিয়ে রাজা নরেন্দ্রলাল খান সবসময়ই সচেষ্ট ছিলেন। ১ লা বৈশাখ নাড়াজোল রাজবাড়িতে একটি বৈঠকী আড্ডার আসর বসত। যেখানে সেই অঞ্চলের বিভিন্ন বিষয়ের পন্ডিতবর্গ ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্রের আবির্ভাব হত। এখানে তাঁরা এই এলাকার মানুষদের কাছে তাঁদের জ্ঞানই তুলে ধরতেন না, নিজেদের মধ্যে জ্ঞানের আদানপ্রদান করতেন। এছাড়া, বছরে যে কোন সময় একবার রাজবাড়িতে ধ্রুপদী সঙ্গীতের আসর বসত, যাকে নরেন্দ্রলাল খান আরও জনপ্রিয় করে তোলেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রথিতযশা সঙ্গীত শিল্পী শ্রী অশেষ বন্দোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায় ও রামপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তবে শুধুমাত্র ধ্রুপদী সঙ্গীতই নয়, স্থানীয় লোকসঙ্গীতকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অস্বীকার করা যায় না। বিভিন্ন পাঁচালি গীতি ও পীরের গান তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পায়।

নরেন্দ্রলাল খান সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন না। তিনি নিজেও ছিলেন একজন সুগায়ক। তিনি তাঁর গুরু রামপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়ের কাছে ধ্রুপদ খেয়াল ও সুর বাহারের নানা ছন্দে সমৃদ্ধ হয়েছিলেন। নাড়াজোলের নাচমহল তাঁর আমল থেকেই একটি অন্য মাত্রা পায়। তবে তাঁর প্রধান কৃতিত্ব হল তিনি নাচ ও গানের মেলবন্ধনের চেষ্টা না করে দুই ক্ষেত্রকেই নিজেদের মত করে বিকাশের সুযোগ দিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রলাল ছিলেন সেতারে পারদর্শী।

রাজা নরেন্দ্রলাল খান যেমন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের একজন অক্লান্ত সৈনিক ছিলেন, তেমনই নাড়াজোল সহ মেদিনীপুর জেলার এক বৃহৎ অংশের সেই সময়কার সমাজসেবা ও সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সত্যই অনস্বীকার্য। সেই সময়ের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও সমাজসেবা ও সুললিত কলার বিকাশে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় এই অঞ্চলটি একটি সমৃদ্ধ ক্ষেত্র হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিল।

উপসংহার

বিংশ শতাব্দীতে মেদিনীপুর জেলার ইতিহাসে নাড়াজোল এবং খান বংশ রাজনৈতিক দিক ও শুধুমাত্র মেদিনীপুর নয় সমগ্র বাংলার ইতিহাসে এক অনন্য স্থানের অধিকারী। তাঁরা শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করা ও জমিদারী রক্ষার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্য করেননি। পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজদের শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে অসীম বীরত্ব ও কূটনৈতিক বিচক্ষনতার সঙ্গে তাঁরা সংগ্রাম করে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। বংশের ধারা অনুযায়ী তাঁরা যেমন সাধারণ মানুষদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তেমনি আবার অন্যদিকে দেশের প্রতি কর্তব্যবোধের দ্বারা চালিত হয়ে স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার নাড়াজোল সহ কর্ণগড় ও মেদিনীপুরে এক বিশাল অঞ্চলের অধিপতি ও বিপুল সম্পত্তির মালিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের শুধুমাত্র জমিদারীর কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখেননি।প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাঁদের দানের কথা জানা যায়। বস্তুত বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে তাঁদের অকৃপণ দানের কথা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তাঁরা দান করতেন। রাজা নরেন্দ্রলাল খানের যোগ্যতম পুত্র কুমার দেবেন্দ্রলাল সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। তিনি বিপ্লবী বিনয়জীবন ঘোষকে তাঁর অর্থসাহায্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, “দেখুন বিনয়বাবু আমি সব রাজনৈতিক দলকেই টাকা দিই। কংগ্রেস ও আপনাদেরই আমি বেশি টাকা দিই। আমার দেশসেবার মানে তো এই। বাবা তিন চার লাখ টাকার একটা জমিদারী রেখে গেছেন। সেই টাকার কিছু কিছু যারাই ইংরেজ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে লড়ছে, তাদের দিয়ে দিই। আমার দেশসেবা

তো আপনাদের মতন জান-প্রাণ কবুল করে ঝাঁপিয়ে পড়া নয়। তবে আমি আপনাকে বলছি যে আমি গ্রেপ্তার হতে বা জেলে যেতে প্রস্তুত। কিন্তু হাত বাড়িয়ে হাতকড়া পরতে চাই না"।[১] মাননীয় ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় রাজা নরেন্দ্রলাল খান নামাঙ্কিত কলেজের উদ্দেশ্যে ১০ ই অক্টোবর, ১৯৬১ সালে বলেছিলেন, "আমি চাই এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা যখন শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বাহিরের জগতে যাইবেন, তাঁহারা যেন পরিপূর্ণ নারীত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন, এবং রাজা নরেন্দ্রলাল খানের দেশাত্মবোধ ও আত্মত্যাগের মহান আদর্শ স্মরণ রাখেন।"

রাজা নরেন্দ্রলাল খানের সময় থেকেই এই বংশের ইতিহাসে ব্রিটিশ বিরোধিতার সক্রিয় সূচনা হয়। বস্তুত তাঁর আগে এই বংশের কোন রাজপুরুষই সক্রিয়ভাবে শাসকবিরোধী কার্যকলাপে এত গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েননি। এই বংশের সীতারাম খান ও তারপরে চুনিলাল খানের সময়ে বিভিন্নভাবে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে এই বংশের মতানৈক্যের সৃষ্টি হলেও তা কখনই বেশি দিন স্থায়ী হয় নি।

কিন্তু রাজা নরেন্দ্রলাল খান যেভাবে স্বদেশী কর্মকান্ডে অর্থসাহায্য করেছিলেন তাতে ব্রিটিশ সরকার শঙ্কিত হয়ে পড়ে। আবার তিনি যে মেদিনীপুর বোমা মামলায় অন্যতম প্রধান বন্দী ছিলেন সেখানে অন্য অনেক জমিদার পরিবারের যোগাযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ইংরেজ সরকার রাজা নরেন্দ্রলাল খানকে প্রধান দোষী সাব্যস্ত করে বিভিন্নভাবে সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত করে। প্রকৃতপক্ষে, এই ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর যোগদান ইংরেজ সরকারের কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। যে কারণে তাঁর গ্রেপ্তারের খবর যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন

[১] ভট্টাচার্য, দেবাশিষ, ত্বদেব, পৃঃ ২৩১

বাংলার বিভিন্ন প্রথম সারির সংবাদপত্রগুলিতে ইংরেজ সরকারের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ নিষ্ঠা সত্ত্বেও কিভাবে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে তিনি অর্থ সাহায্য করেছিলেন তার বিবরণ পাওয়া যায়। অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রায় কয়েক মাস ধরে এই মামলা ও সেই সঙ্গে রাজা নরেন্দ্রলালের জামিনের বিষয়টি আলোচনা হতে থাকে।

এই মামলার সূত্র ধরে নাড়াজোল অঞ্চলে বসবাসকারি কিছু প্রজার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতি হয়। যে রাজা এই এলাকার উন্নতিবিধানের জন্য বিভিন্ন কার্যকলাপের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন, সেই রাজার বিরুদ্ধেই কয়েকজন প্রজা অভিযোগ জানিয়েছিলেন যে রাজা তাঁদের ভয় দেখিয়ে আদালতের সামনে তাঁদের জবানবন্দীকে পাল্টাতে চাইছে। ২৭ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১১ সালে নরেন্দ্রলাল খানের বিরুদ্ধে তাঁর তিনজন প্রজা – পিতাম্বর রায়, অক্ষয়কুমার পাল এবং সুজিবুদ্দিন অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল নরেন্দ্রলাল খান এবং তাঁর গোমস্তা গোপাল রায় তাঁদের জোর করে স্বদেশী ভান্ডারে চাঁদা দিতে বাধ্য করেছে। সুজিবুদ্দিন লিখিতভাবে জানান যে, ‘রাজা স্বদেশী ভান্ডারের জন্য ৫০ টাকা চাঁদা দিতে বলেন। তিনি চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় রাজা বলেন যে স্বদেশীদের বিরুদ্ধে যাবার জন্য সামসুল আলমকে মেরে দিয়েছি। টাকা না দিলে তোমারও একই পরিণতি হবে’।

এই পরিস্থিতিতে রাজার বিরুদ্ধে সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়। অমৃতবাজার পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় এই বিষয়ে নিয়মিতভাবে সংবাদ প্রকাশ হতে থাকে। প্রায় এক বছর পরে মামলাটির নিষ্পত্তি হয়। ইংরেজ সরকার সরকারী গোয়েন্দা বিভাগকে রাজার গতিবিধি লক্ষ্য করার নির্দেশ দেন। ইংরেজ সরকারের সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা, যা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে এসেছিলেন

সেগুলি থেকে তিনি বঞ্চিত হন। এমনকি নরেন্দ্রলাল খানকে যাতে প্রজারা রাজস্ব না দেন সেই বিষয়েও ইংরেজ সরকার প্ররোচনা দিতে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, অদম্য স্বাধীনতাস্পৃহা, আত্মশক্তি ও অনমনীয় ব্যক্তিত্বের জন্য রাজা নরেন্দ্রলাল খান সমগ্র মেদিনীপুরে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। ১৯১৩ সালে মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার থাকাকালীন সময়ে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। দেশপ্রেম, শিক্ষাক্ষেত্র, গ্রামোন্নয়ন এবং দেশীয় শিল্পস্থাপনের ক্ষেত্র রাজা নরেন্দ্রলাল খান যেভাবে এগিয়ে এসেছিলেন, তা সত্যই প্রশংসনীয়। তাঁর অকৃপণ দানে সেই সময়ের অনেক জনহিতকর কাজ সম্পাদিত হয়েছিল।

ঘাটাল-নিমতলা

সংস্কৃত সমিতির

একবিংশ বাৎসরিক বিবরণী।

১৮৩৪ শকাব্দাঃ।

কালাপকর্ষান্নৃপবিপ্লবাদ্বা নিসর্গতো বাবগতিং গতস্য।

সমুদ্ধৃতৌ সংস্কৃতরত্নরাশেঃ, জনৈঃ প্রযত্নঃ সততং বিধেয়ঃ।।

সম্পাদকশ্রমেণৈব ন্যায়রত্নপ্রযত্নতঃ।

আর্যাধর্ম্মহিতার্থায় শুভেয়ং স্থাপিতা সভা।।

নৃপশ্রীমন্নরেন্দ্রস্য নারাজোল-নিবাসিনঃ।

সাহায্যেন সভাশোভা বর্দ্ধতে ক্রমশোহধুনা।।

নির্বাহক সভার অনুমত্যনুসারে

প্রকাশিত।

সংস্কৃত-সমিতি কার্যালয় নিমতলা।

ঘাটাল।

১৮৩৫ শকাব্দাঃ। (১৯১৩)

ঘাটাল-নিমতলা

সংস্কৃত-সমিতির

নির্ব্বাহক সভা

১৮৩৫। ১৮৩৬ শকাব্দাঃ।

অবিভাবক

শ্রীযুক্ত রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁন্ বাহাদুর

নারাজোল

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্. এ. পি.এইচ.ডি।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্. এ

সভাপতি

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামেশ্বর তর্কসিদ্ধান্ত।

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গুঁই

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্য নাথ গুঁই।

তত্ত্বাবধায়ক।

ঘাটাল সংস্কৃত সমিতির মহা পরিচালক পন্ডিত মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রদত্ত রাজা নরেন্দ্রলাল খানের প্রতি অভিজ্ঞান পত্র

শ্রী শ্রী সরস্বতী

জয়তি!

অভিনন্দনপত্রম্

স্বস্তি সকলকুশলকলাপকমনীয় কলেবর বরদাবর বিজৃম্ভিত বিবিধ

বিদ্যাবিনিত বিবুধসাৎকৃতবহুবিত্ত বদান্যবর শিষ্টশান্তস্বভাব রাজ

শ্রীল শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল খান বাহাদুর মহোদয় শ্রীকরকমলেষু

সমর্পিতমিদমস্তু।

রাজন,

সম্প্রতি তত্রভবতা ভবতা সম্রাট্সমীপতঃ সম্মানভূমিঃ সমাসাদিতো রাজোপাধিঃ শ্রুতএব-চকোরাণাং চন্দ্রঃ কুসুমসময়ঃ কানভুবাং

সরোজানাং ভানুঃ কুবলয়কদম্বং মধুলিহাম্।

ময়ুরাণাং মেঘঃ প্রথরতি যথা চেতসি সুখং

তথাস্মাকং রাজন্ জনয়তি পরাং প্রীতিমতুলাম।

যুজ্যতে চৈতৎ, যতঃ

লক্ষ্মীশ্চেন্ন সরস্বতী তমুভয়ং যদ্যস্তি নোদারতা

সা চৈতন্ত্রিতয়ং ভবেচ্চ কুহচিৎ পুণৈরগণৈরপি।

সৌজন্যং ন বিজৃম্ভতে তদপি চেন্নাস্ত্যেব কৎপ্তা মতি

স্তৎ সর্বং পরমেশ্বরস কৃপা ত্বয্যেব সম্ভাব্যতে।।

অপিচ।

বংশমর্য্যাদয়া বা বিপুলসম্পদধিকারসৌভাগ্যলক্ষ্যা বা দয়াদাক্ষিণ্য সৌজন্যঘুণসম্পদা বা সচ্ছবারিবিতরণযন্ত্রনির্মাণব্যয়াদিষমুক্ত-হস্ততয়া বিদবর্দ্ধনার্থমনেকার্থদানগৌরবেণ বা এবম্বিথসাধারণোপকারক বহুল সৎকর্ম্পরম্পরায়া বা সর্বথৈব রাজোপাধিযোগ্যং তত্রভবন্তঃ।

ভবন্তু তদুপাধিদানেনালঙ্কুর্বন্তো রাজপুরুষা-যোগ্যকারিণএবেতি মন্যামহে।

তদদ্য বয়মানন্দসন্দোহোচ্ছলনার্দ্রীকৃ তহৃদয়া আন্তরং ভাবমা-এব সমাবেতাঃ

সংস্কৃতসমিতিসভ্যা প্রধানরাজপুরুষাণ্ ধন্যবাদেন সভাজয়ন্তঃ পরতস্তু পশ্লোকয়ন্তশ্চ মঙ্গলমাগাস্মহে। যেন পুরুষায়ু.....স্বাস্থ্যসুখমূপভুঞ্জানা নিরাপদশ্চ সহৈব পরিবারবর্গৈঃ সুখসচ্ছন্দজনিতম নন্দমনুভবন্তু ভবন্তঃ।

রাজন্নভ্যুদয়োহস্তু জীব শরদাং পূর্ণ সাম্বয়ো

রুঙনৈবাস্তু তবান্তিকে প্রতিদিশং কীর্তীন্দুরদ্যোততাম্।।

শিষ্টান্ পাহি বুধান্ সভাজয় ধনৈঃ সম্বর্দ্ধয়স্বার্থিন

শ্চিত্তং নাথ তবাস্তু ধর্ম্যনদনুষ্ঠাসপ্রসঙ্গে সদা

কমলভূতদয়া বদনাম্বুজে

বসতু তে কমলা করপল্লবে।

বষি তে রমতাং কমলাঙ্গজ

প্রতিদিনং হৃদয়ে কলাপতিঃ

গ্রহাঃ সর্বে দিশঃ সর্বাঃ সর্বে স্থাবর জঙ্গমাঃ

ইষ্ট সিদ্ধৌ প্রদীদন্তু সদৈতন্নব ভূপতো।

সভ্যগণরহিত সহকারি সভাপতিঃ

ঘাটাল-নিমতলা

সংস্কৃত সমিতি

শকাব্দ ১৮১৭

To,

The Hon'ble Mr. H.L. Stephenson, C.I.S., C.E.I., I.C.S.,

Chief Secretary to the Government of Bengal.

Through A.W. Cook, Esq., C.I.E., I.C.S.,

District Magistrate, Midnapore,

To His Excellency The Right Honourable

Lawrence John Lumley Dundas,

Earl of Ronaldshay, G.C.I.E., P.C.,

Governor of Bengal.

The humble Memorial of Raja Narendra Lal Khan of Narajole.

Most Respectfully Sheweth :-

1st. Your memorialist is a representative of a very ancient family which rose to eminence during the Mohamedan rule and received honours and titles from the Mogul Government.

2nd. Your memorialist's grand-father and father set an example of loyalty, benevolence and public spirit which was repeatedly recognized by Government, and the title of Raja was conferred upon them.

3rd. Your memorialist has attempted to follow in the footsteps of his illustrious predecessors, and in his humble way has done what he could to make himself useful to Government, and in promoting the well-being and advancement of his fellow-countrymen.

4th. His steadfast loyalty won for Your memorialist the good opinion of nearly all the District officers of Midnapore.

5th. In 1895 the Government of his Excellency Lord Elgin conferred the title of Raja on your memorialist.

6th. In conferring the said title Sir Charles Elliott, who was then the Lieutenant-Government of Bengal, said : "Raja Narendra Lal Khan's family has long held a position of respect in Midnapore district and has been honoured with the title of Raja. It was in recognition of this fact as well as the Raja's personal merits, that this title has been bestowed on him by His Excellency the Viceroy. The Raja has distinguished himself by diverse public acts which contributed greatly to local benefits, and by largely subscribing to the Dufferin Fund."

By Notification No. 4056-J., 26th August,1898, Your memorialist was exemption from the Arms Act for ten retainers.

7th. Your Excellency's memorialist continued to enjoy good opinion and confidence of Government till Mr. Donald Weston came to Midnapore as Magistrate and Collector of the District.

8th. Mr. Weston was persuaded by designing persons to believe that Your memorialist's desire to give an impetus to the indigenous industry of the country was a cloak for disloyal designs against the Government.

9th. Attempts were made to put Your memorialist into difficulties in connection with the political unrest which had come upon the country since the Partition of Bengal – an unrest which was confined to irresponsible and hare-brained young men of little or no education, having no stake in the country, and without any definite means of livelihood.

10th. Your Excellency's memorialist passed through very difficult times, which did not cease till all proceedings against him were dropped in November 1908.

11th. Though he suffered a great deal of harassment, and the indignity of confinement in a solitary cell in jail, Your memorialist has steadfastly adhered to the path he had always followed steadfastly, followed in the wake of his illustrious predecessors, in their loyalty and devotion to public duty.

12th. Your memorialist had a share in the building of the Midnapore town school.

13th. In 1910 some disputes arose with his co-shares about the possession of the said school.

14th. Acting upon legal advice, Your memorialist took possession of the school, and in assertion of his rights, and with a view to constitute a cause of action if ousted therefrom, placed it in charge of retainers, who without Your memorialist's knowledge went armed.

15th. Under the order of the District Magistrate Mr. Marr, Your memorialist subsequently withdrew his reainers from the school.

16th. No body regretted more than Your memorialist the faulty legal advice and error of judgement which led to the regretable incident, and Your memorialist offered his unqualified apology to the authorities.

17th. An enquiry was ordered by the Government of Bengal in the matter, and in their Resolution 1971-P.D., dated 5th July, 1910, the exemption granted to Your memorialist for ten retainers' licenses by Notification No. 4056-J. was cancelled.

18th. Since then Your memorialist has tried to steadfastly adhere to the example set by his illustrious predecessors in their loyalty and devotion to public duty.

19th. Your memorialist has liberally helped in all movements pertaining to the welfare of the district. Among other things he has subscribed Rs. 50,000 for the water works of Midnapore town.

20th. When the Great European War broke out Your memorialist did what he could to make himself useful in the service of his King and country; that besides giving about Rs. 5,000 to the War relief and other connected funds, Your memorialist purchased War bonds, and cash certificates, etc. to the extent of about Rs. 75,000.

21st. Throughout the War he has subscribed liberally to the fund of the Bengal Light Horse branch of the I.D.F., paying the whole of the rent of the houses and ground in which they were located in Calcutta.

22nd. Aware that mere money was not enough, and it was the duty of every loyal Indian to come forward in the defence of the Empire, Your memorialist had hoped to set an example by joining the I.D.F. personally. Unfortunately his age prevented him doing so, but he sent his eldest son Kumar Debendra Lal Khan to join the Bengal Light House, and he completed his training thereon.

23rd. From time immemorial in India noblemen always had retainers. Your memorialists holds about 3,000 villages. In sending revenue from the interior an armed guard is necessary.

24th. Your memorialist humbly ventures to hope that a single act of thoughtlessness will not in the eyes of Government outweigh a record of royal service and devotion to public duty.

25th. Your Excellency's memorialist prays :-

(1) That Your Excellency will graciously be pleased to restore to him the privilege of keeping ten armed retainers from the operations of the Arms Act, granted to him by Notification No. 4056-J of 26th August,

1898, and cancelled subsequently by Resolution No. 1971-A. of 5th July, 1910.

(2) That Your Excellency will graciously be pleased to direct that his name be re-inserted in the Durbar List.

(3) That in all other matters he be restored to his former position and dignity.

and your Memorialist as in duty bound shall ever pray.

Raja Narendra Lall Khan

To

His Excellency

The Right Honourable

Lawrence John Lumley Dundas, Earl of Ronaldshay, G.C.I.F., P.C.,

Governor of Bengal.

MEMORIAL OF

RAJA NARENDRA LAL KHAN

of Narajole

চিত্রসূচী

১. রাজা নরেন্দ্রলাল খান

২. কুমার দেবেন্দ্রলাল খান

৩. রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়ে রক্ষিত কিছু দুষ্প্রাপ্য ছবি

গ্রন্থবিবরণী

সাক্ষাৎকার

ডঃ মঙ্গল কুমার নায়ক, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, গড়বেতা কলেজ

শ্রী সন্দীপ খান, নাড়াজোলের খান বংশের সদস্য ও 'নাড়াজোল পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণ কমিটি'র কর্ণধার

শ্রী দেবাশিষ ভট্টাচার্য, 'নাড়াজোলঃ এক অনন্য জনপদ' গ্রন্থের লেখক

পত্রিকা

Amrita Bazar Patrika

প্রাথমিক উপাদান

ও'ম্যালি, এল.এস.এস; 'Bengal District Gazetteers: Midnapore', The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1911

খান, রাজা মহেন্দ্রলাল, 'History of the Midnapore Raj', Thacker, Spink and Co., Calcutta, 1889

হান্টার, ডব্লিউ. ডব্লিউ., 'Statistical Account of Bengal', District of Midnapur and Hugli, Vol-III, Trubner & Co., London, 1886

গৌণ উপাদানঃ বাংলা

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবিধ প্রবন্ধ ‘বঙ্গদেশের কৃষক’, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র বাঙলা রচনা, শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক লিখিত, বঙ্কিম সাহিত্যের পরিচয় সমন্বিত, প্রকাশক সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ দোল পূর্ণিমা,১৩৬১ বঙ্গাব্দ

চৌধুরী, অমিতাভ, ‘জমিদার রবীন্দ্রনাথ’, প্রকাশক বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, শান্তিনিকেতন, ১৯৭৬

চৌধুরী, কমল (সম্পাঃ), ‘মেদিনীপুরের ইতিহাস’, প্রথম পর্ব, দে’জ পাবলিশিং, জানুয়ারী, ২০০৮

দত্ত, বিমলচন্দ্র, ‘বাংলার খেতাবী রাজ-রাজড়া’, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ইন্সটিটিউট অফ রিসার্চ অ্যান্ড কালচার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, স্বাধীনতা দিবস (৪৬ তম), ১৫ ই আগস্ট, ১৯৯২

দাস, বসন্তকুমার, ‘স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর’, প্রথম খণ্ড, প্রকাশক মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস সমিতি, মেদিনীপুর, আগস্ট ১৯৮৩

দাস, বিনোদশঙ্কর ও রায় প্রণব, ‘মেদিনীপুরঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন’ (প্রথম খণ্ড), সাহিত্যলোক প্রকাশন, কলকাতা, ১৫ ই আগস্ট ১৯৮৯

দাস, হরিসাধন, ‘মেদিনীপুর সম্পদ’, মেদিনীপুর, ৩০ শে আষাঢ় ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ

বসু, অতুলচন্দ্র, ‘মেদিনীপুর বোমা-পিস্তল’, প্রকাশক এ. মুখার্জী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বাংলা ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

বসু, যোগেশচন্দ্র, ‘মেদিনীপুরের ইতিহাস’, প্রকাশক সেন ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ্ অন্নপূর্ণা প্রকাশক, কলিকাতা, পৌষ ১৪১৬

বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, ‘পলাশী থেকে পার্টিশনঃ আধুনিক ভারতের ইতিহাস’, প্রকাশক ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০০৬

ভট্টাচার্য, দেবাশিষ, ‘নাড়াজোলঃ এক অনন্য জনপদ’, নাড়াজোল আর্কিওলজিক্যাল প্রিজারভেশন কমিটির উদ্যোগে প্রকাশিত, মেদিনীপুর, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

মজুমদার, রমেশচন্দ্র, ‘বাংলাদেশের ইতিহাস’, তৃতীয় খণ্ড, প্রকাশক জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রাবণ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ

রায়, পঞ্চানন ও রায়, প্রণব, ‘ঘাটালের কথাঃ ঘাটাল মহকুমার ইতিহাস ও সমাজচিত্র’, ১ ম ও ২ য় খণ্ড, প্রকাশক সদেশ, কলকাতা, জুলাই ১৯৭৭, রথযাত্রা, শ্রাবণ ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ

রায় প্রণব, ‘মেদিনীপুরঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন’ (চতুর্থ খণ্ড), সাহিত্যলোক প্রকাশন, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১০

সেন, শচীন, ‘বাংলার রায়ত ও জমিদার’, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, প্রকাশক শ্রী পুলিনবিহারী সেন, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১ লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ

হবিব, ইরফান, ‘মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা (১৫৫৬-১৭০৭)’, প্রকাশক কে পি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫

গৌণ উপাদানঃ ইংরেজি

Chatterjee, Gouripada, ‘The Forerunner of India’s Freedom Struggle’, Mittal Publication, Delhi, 1986

Chatterjee, Pranab Kumar, ‘Midnapur’s Tryst with Struggle’, The State Archives of West Bengal, 2004

Ray, Aniruddha, ‘Adventurers and owners and rebels’, New Delhi, 1998

প্রবন্ধ

চট্টোপাধ্যায়, সুদিন, ‘নাড়াজোল রাজপরিবারঃ দেবেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ’, নাড়াজোল কলেজের সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, ২রা মে, ২০০৭

নায়ক, মঙ্গল কুমার, ‘গোয়েন্দা নথিতে ১৯০৮ সালের মেদিনীপুর বোমা মামলায় নাড়াজোল রাজ’, ইতিকথা, বর্ষ ১, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৩

নায়ক, মঙ্গল কুমার, ‘বৈপ্লবিক সংস্কৃতি চর্চার সম্প্রসারণে নাড়াজোল এইচ. ই. স্কুল’, Vidyasagar University Journal of History, Volume IV, 2015-2016